অভাগী

(তৃতীয় খণ্ড)

রায় শ্রীজলধর সেন বাহাদুর

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

আট আনা

প্রকাশক
শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩/১/১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্
কলিকাতা

আশ্বিন—১৩১৯

প্রিণ্টার শ্রীনরেন্দ্রনাথ কোঙার
ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস
২০৩/১/১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

দু'টি কথা

অনেক দিন আগে সোদরপ্রতিম শ্রীমান্ শান্তি দত্তের আগ্রহে 'অভাগী' লিখ্‌তে আরম্ভ করি। আমি ব'লে যেতাম শ্রীমান্ শান্তি লিখে নিত। শেষে শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় ভায়ার অত্যধিক তাগাদায় তাড়াতাড়ি নিজেই লেখা শেষ করি এবং হরিদাসবাবু এখানিকে তাঁর আট-আনা-সংস্করণ-গ্রন্থমালার প্রথম গ্রন্থরূপে প্রকাশ করে, 'অভাগী'র গৌরব বৃদ্ধি করেন। তার কিছুদিন পরে দ্বিতীয় খণ্ড নিজের ইচ্ছাতেই লিখি। তৃতীয় বা শেষ খণ্ড লিখ্‌বার উৎসাহ আমার একেবারেই ছিল না। বিগত বৎসর (১৩৩৮) পূজার সময় আমি স্বাস্থ্যলাভের জন্য সুদূর রেওয়া রাজ্যে আমার বৈবাহিক, সেখানকার ষ্টেট ইন্‌জিনিয়ার শ্রীযুক্ত শ্রীপতি ঘোষ মহাশয়ের আতিথ্য গ্রহণ করি। সেই সময় তাঁহার বিদুষী কুমারী কন্যা শান্তি আমাকে 'অভাগী'র শেষ খণ্ড লিখ্‌বার জন্য উত্তেজিত করেন এবং প্রথম খণ্ড লিখ্‌বার সময় শ্রীমান্ শান্তি যেমন স্বেচ্ছায় লিপিকরের কার্য্য করেন, এবারেও আর এক 'শান্তি'—আমার দুহিতাসমা কুমারী শান্তি খাতা বেঁধে, আমার মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে লিখ্‌তে আরম্ভ করেন। তারপর, আমি যখন রেওয়া থেকে চ'লে আসি, তখন শান্তির

কাছে আমাকে প্রতিশ্রুত হ'তে হয় যে, বইখানি আমি শেষ করব। এক বৎসর পরে আমি সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছি; এবং এই শেষ খণ্ড কুমারী শান্তির নামে উৎসর্গ করে বিমল আনন্দলাভ করলাম। ইতি

কলিকাতা
আশ্বিন, ১৩৩৯

শ্রীজলধর সেন

কুমারী শান্তি ঘোষের

করকমলে—

অভাগী

তৃতীয় খণ্ড

এক

[সুশীলার কথা]

হরিদ্বারের এই স্বামীজির আশ্রমে আমার তো প্রায় দু'টী বছর কেটে গেল।

এতদিন স্বামীজি যা আদেশ করেছেন, নির্ব্বিচারে তা পালন করেছি। করেছি কি—এখনও করছি। কিন্তু এই যে দু' বছর গেল, এর মধ্যে লাভ-লোকসানের একটা হিসাব করা দরকার হয়েছে।

কেহ হয়তো বলবেন, ওর আর হিসাব-নিকাশ কি? অচলানন্দ স্বামী যে পথ দেখিয়ে দেবেন তাই তোমার পক্ষে শ্রেয়ঃ। তুমি অবিচলিতচিত্তে সেই পথে তাঁর নির্দ্দেশ অনুসারে কাজ ক'রে যাবে। ফলের আকাঙ্ক্ষা তো তোমায় করতে হবে না, সে সব গুরুদেবকে সমর্পণ ক'রে তুমি নিষ্কামভাবে কাজ

ক'রে যাবে। এই তো তোমার কর্ত্তব্য। তবে আর লাভ-লোকসান দেনা-পাওনার কথা তোলো কেন?

এতদিন এই দুই বৎসর তাই তো ক'রে এসেছি। কোনো দিন একটা কথা—একটা প্রশ্ন—একটা দ্বিধা আমার মনে হ'য়নি। আজই যে হয়েছে তাও ঠিক বল্‌তে পারি না।

কিন্তু এই কয়েকদিন থেকে আমার নিজের কথা সর্ব্বদাই মনে উঠছে। সেই কথাগুলোই একটু গুছিয়ে বল্‌ছি।

এই আশ্রমে যখন এসে পৌঁছুলুম, স্বামী আত্মানন্দ যখন আমাকে সাজাহানপুরে সেই নরপশুর হাত থেকে অভাবিতরূপে উদ্ধার ক'রে নিয়ে এসে এই ভূস্বর্গ হরিদ্বারের গঙ্গাতীরে স্বামীজির পাদমূলে আমাকে সমর্পণ করে দিলেন, তখন আমি মনে করেছিলুম আমি পথ পেয়েছি। বাবা বিশ্বনাথ আমাকে ঠিক জায়গায় পৌঁছে দিয়েছেন। তখন আমি নিঃসঙ্কোচে তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলুম। তারি চার পাঁচদিন পরে হবে বোধ হয়, বড়-মাসীমা ও তিনকড়ি মামা এই আশ্রমে এলেন। তাঁরা আমাকে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাইলেন। আমি তখন বলেছিলুম—আমি আর লোকালয়ে যাব না। এই আশ্রমেই জীবনের অবশিষ্ট কয়টা দিন কাটিয়ে দেব। স্বামীজি কিন্তু তখন বলেছিলেন—তোমাকে এখান থেকে যেতেই হ'বে, কিন্তু এখন নয়।

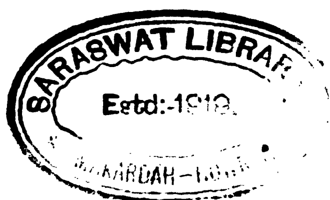
তার ৭।৮ মাস পরে হরেনবাবু, খুড়ীমা ও রাণীকে নিয়ে এই আশ্রমে এলেন। রাণীর কোলে ছেলে। সে ছেলে দেখে

আমার প্রাণ অধীর হ'য়ে গেল। তাকে নিয়ে যে কি করব ভেবে পেলাম না। পুরো একটা সপ্তাহ সেই মায়ার বন্ধনে কেটে গেল। স্বামীজির নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য-কর্ম্ম আমি সেই সাতদিন অবহেলা করলাম। স্বামীজি কিন্তু একটা কথাও বল্লেন না; বরঞ্চ রাণীর সেই ছেলে ভবশঙ্করকে আদরে-চুম্বনে একেবারে অধীর ক'রে তুলেছিলেন। কিন্তু সাতদিনের পরে কে যেন আমার প্রাণের ভিতর থেকে ব'লে উঠ্ল, ও কি কচ্ছ। এ তোমার পথ নয়। অমনই আমার হৃদয় কঠোর হ'য়ে উঠ্ল। অমন মোহের বন্ধন অম্লানবদনে ছিন্ন ক'রে তাদের বিদায় দিলাম। একবারও মনে হ'ল না তাদের কাছে, স্বর্গীয় সতীশকাকার কাছে, আমার কি অপরিশোধনীয় ঋণ।

তারপর শুন্বে? রাণীরা চলে যাবার মাস ৩।৪ পরে হঠাৎ একদিন তিনকড়িমামা এসে উপস্থিত হ'লেন। তিনি বল্লেন বড়-মাসীমা কঠিন রোগে শয্যাগত; ডাক্তারেরা বলেছেন তাঁর আর বাঁচবার আশা নেই। তাঁর বড়ই ইচ্ছা জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে একবার আমাকে দেখেন। এই সংবাদ শুনে আমি ক্ষণেকের জন্য জ্ঞানশূন্য হ'য়ে পড়লুম। বড়-মাসীমা মৃত্যুশয্যায় আমাকে দেখতে চেয়েছেন—যেতেই হবে; কিন্তু পরক্ষণেই কে অলক্ষ্যিতে থেকে আমার প্রাণের মধ্যে দৈববাণী করল, না—না, ও-পথ তোর নয়। আমি কঠিন পাষাণে বুক বেঁধে বল্লুম—ফিরে যাও তিনকড়িমামা, আমি যাব না। ও-পথ আমার নয়। মাসী-মা মরবেন না; নিশ্চয়ই বেঁচে উঠবেন। এ আমি

তোমায় বলে দিচ্ছি। সেই কথা মনে হয়েই এতদিন পরে আমার মনের মধ্যে যে কথা উঠেছে, তা আমি চেপে রাখতে পাচ্ছি না—যে, ও-পথ আমার নয়—এ-পথ আমার নয়—সে-পথ আমার নয়, তবে কোন্ পথ আমার? তোমরা হয় তো দৃঢ়তার সঙ্গে বলবে—সে ভাবনা তোমার কেন? গুরু যে পথ নির্দ্দেশ করবেন সেই পথে চলো।

এইখানেই খট্‌কা লেগেছে বন্ধু! এমন করে চলবার বিরুদ্ধে আমার নারীশক্তি আজ মাথা নাড়ছেন। সুতরাং ন্যায় হোক, অন্যায় হোক, এই দু'বৎসরের কৃতকার্য্যের একটা হিসাব-নিকাশ না করে থাকতে পাচ্ছি না।



দুই

এই আশ্রমে এসে প্রায় দু'বৎসর আমি কি করেছি এবং এখনও কি কচ্ছি, তারই একটা হিসাব দিই। প্রথম যেদিন আত্মানন্দস্বামীর সঙ্গে এখানে এলাম, সেইদিনই কি জানি কেন, আগে থেকেই আমার জন্ত একটা কুটীর নির্দ্দিষ্ট হ'য়েছিল। আশ্রমের অন্ত সকল বাসগৃহ, স্বামীজির আসন, এ সব আমার কুটীর থেকে দূরে ছিল। কোনো রকম কোলাহল আমার শান্তির বিঘ্ন না করতে পারে স্বামীজি সেই ব্যবস্থাই করেছিলেন। পথে আসবার সময় লোকের সন্দেহ-দৃষ্টি এড়াবার জন্ত আত্মানন্দ-স্বামী আমাকে একখানা গৈরিকবস্ত্র পরতে দিয়েছিলেন। তাই প'রেই আমি প্রথম স্বামীজির সম্মুখে উপস্থিত হই। আমার পরণে সেই গেরুয়া রং-করা কাপড় দেখেই স্বামীজি বলেছিলেন, ভিতরে রং না ধরলে বাইরে ও-রঙ চলে না। কথাটা আমিও বুঝেছিলুম। এই যে গৈরিক বসন, ইহা এক দিন পৃথিবী একেবারে মুগ্ধ ক'রে ফেলেছিল; এই গৈরিকবসনই আমেরিকার ধর্ম্মমণ্ডলে স্বামী বিবেকানন্দজিকে জগজ্জয়ী ক'রেছিল। এই গৈরিকের রংয়েই তাঁর হৃদয় রঞ্জিত হ'য়েছিল; তাই তিনি তাঁর জীবনের সর্ব্বপ্রধান বক্তৃতায় অভূতপূর্ব্ব বাগ্বিভূতি দেখিয়ে সমস্ত সভ্য-জগৎকে বিমুগ্ধ ও স্তম্ভিত করে দিয়েছিলেন। আমাদের দেশ যে এত গরীব হয়েছে, তবুও

এই গৈরিক-পরা কেউ গিয়ে কোন অতি দরিদ্রের দুয়ারের সম্মুখে "নমো নারায়ণ" ব'লে দাঁড়ালে সেই দরিদ্র ব্যক্তিও তাকে বিমুখ করতে পারে না। তার সেই বহুকষ্টসংগৃহীত সামান্য অন্নের অংশ সহাস্যমুখে সাধুর হাতে তুলে দেয়। আবার এই গৈরিকের আবরণে আচ্ছাদিত হ'য়ে কত জন কত রকমে কত বীভৎস কার্য্যের অনুষ্ঠান করে থাকে, গৈরিক বস্ত্র ভেদ করে তা বাইরে আত্মপ্রকাশ কর্ত্তে পারে না। তার প্রমাণ আমি আমার জীবনেও পেয়েছি। যাক্ গিয়ে সে কথা। আমি কিন্তু অধিকারী না হ'য়েও সেই আত্মানন্দস্বামীর দেওয়া গৈরিক বসন পরেছিলুম, আজও তা ছাড়ি নি। অন্ধভাবে সেই বসনের ছদ্মবেশেই এতদিন কাটিয়েছি, স্বামীজিও কোনদিন কোন আপত্তি করেন নি।

কিন্তু এই আবরণ—এই ছদ্মবেশ এখন আমাকে পীড়া দিতে আরম্ভ ক'রেছে। সাধু সন্ন্যাসীর পবিত্র তপোবনে আছি, তাঁদের সেবা কচ্ছি, তাই তাঁদেরই মতন বসন পরিধান ক'রে এতদিন কাটিয়েছি। এখন কিন্তু ও-নিয়ে মনে খট্‌কা বেধেছে—কেন তা জানি না।

এই আশ্রমে এতদিন কি ভাবে কাটিয়েছি, তাই আগে বলি। স্বামীজির আদেশমত সূর্য্য-উদয়ের পূর্ব্বেই গঙ্গাস্নানে গিয়েছি। আমার কুটীরে বিছানাপত্র বা আসন দূরে থাকুক, ছোট একটা জলের পাত্রও প্রবেশাধিকার পায় নি। গ্রীষ্মকালে মাটীতে শুয়েই কাটিয়েছি; শীতকালে হরিদ্বারের প্রবল শীতেও একখানি

কম্বলের বেশী আমার প্রয়োজন হয় নি। কি শীত কি গ্রীষ্ম, সূর্য্যের অনুদয়কালে গঙ্গাস্নান করেছি, তাতে আমার একটুও কষ্ট হয় নি, একটুও অসুবিধা বোধ হয়নি। গঙ্গাস্নান করে উঠে সেই ভিজে কাপড়েই স্বামীজি যে ছোট একটা শ্লোক আমাকে শিখিয়ে দিয়েছেন, পূর্ব্বদিকে মুখ করে আমি সেই ছোট শ্লোক আবৃত্তি করেছি—

"জবাকুসুম সংকাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধ্বন্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্॥"

এই বলে তখনও অনুদিন দিবাকরকে প্রণাম করেছি,—সে প্রণাম তিনি নিয়েছেন কি না, এখনও নেন কি না, এ কিন্তু আমি আজও বুঝতে পারলুম না। কিন্তু উষার অরুণ-রাগাগমের পূর্ব্বে স্নানান্তে অদূরে অভ্রভেদী হিমালয়ের যে মহিমময় মূর্ত্তি আমি দেখেছি, তার সম্মুখে প্রণতা না হ'য়ে আমি পারি নি। সে প্রণাম তিনি গ্রহণ করেছেন—নিশ্চয়ই করেছেন, এ আমি জানি, এ আমি প্রাণে অনুভব করেছি। নইলে তাঁরই প্রেরিত মলয় পবন আমার প্রাণে শান্তি বর্ষিত করত না; নইলে তাঁর হৃদয় নিঃসৃত অমৃতধারা পতিতপাবনী গঙ্গা কুলুকুলু স্বরে কত অমৃতময়ী বাণী শুনিয়ে দিত না। এ সব কথা বলতে গেলে আমি কেমন আত্মহারা হ'য়ে যাই, তাই আমার এই প্রগল্ভতার জন্য ক্ষমা চাই বন্ধু! তোমাদের কাছে ক্ষমা চাই!

স্নানান্তে আশ্রমে ফিরে এসে আর্দ্র বস্ত্র পরিত্যাগের আর

সময় পেতাম না। সাধু-সন্ন্যাসীরা ও আশ্রমের সকলে জেগে উঠতেন; আমার দিনের কার্য্য আরম্ভ হ'ত। তাঁদের তত্ত্বাবধান, তাঁদের সেবার ব্যবস্থা কি জানি কেমন করে আমার উপরে এসে পড়েছিল। স্বামীজি দিয়েছিলেন, না আমি নিজেই নিয়েছিলাম, তা ঠিক বলতে পারি না। আশ্রমবাসীদের যার যা দরকার সে সব আমি আমার দৃষ্টির সম্মুখে নিয়েছিলুম। গৃহস্থের সংসার ছেড়ে দিয়ে সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী, পবিত্রচেতা শিক্ষার্থী এদেরই বৃহৎ সংসার আমি মাথায় করে নিয়েছিলুম। স্বামীজি দেখতেন, আর একটু হেসে বলতেন, এই যে মা জগজ্জননী! তোর কি শ্রান্তি—ক্লান্তি নেই মা! আমি তাঁর সে কথার উত্তর দিতে পারতুম না। সারাদিন আশ্রমের অধিবাসীদের সেবা অক্লান্তভাবে ক'রে যেতুম। পশুপক্ষী—বৃক্ষলতা পর্য্যন্ত আমার সেবায় বঞ্চিত হয় নি। সায়াহ্নে আমার কুটীর-সম্মুখের গাছের তলায় আশ্রমের ভাণ্ডার থেকে যে সামান্য ফলমূল রেখে যেত তারই কিছু আমি গ্রহণ করতুম। অবশিষ্ট অংশ সেখানেই পড়ে থাকত; আমার কুটীরের মধ্যে তারা যেতে পারত না। আমার সারাদিনের কাজই ছিল এই। তারপর সন্ধ্যা লাগত; আশ্রমবাসীরা পূজা-মণ্ডপের সম্মুখে দাঁড়িয়ে সামগান করতেন; আমি ধূপ-দীপ জ্বালিয়ে দিয়ে তাঁদের সকলের পিছনে এসে তাঁদেরই দেখাদেখি হাতযোড় ক'রে দাঁড়াতুম। তাঁরা যে বেদমন্ত্র গান করতেন, আমি তাতে একদিনও যোগ দিতে পারি নি। আমার মনে হ'ত, এঁদের এই সকল দৈনন্দিন অনুষ্ঠানের

ভিতর প্রাণ নেই, আনন্দ নেই ; এ যেন একটা কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠান। তার পর তাঁরা তাঁদের কুটীরে চলে যেতেন, আমি স্বামীজিকে প্রণাম ক'রে নিজের অন্ধকার নির্জ্জন কুটীরে যেতুম। তারপর সারারাত্রি শুধু অন্ধকার—শুধু অন্ধকার—শুধু অন্ধকার!



তিন

সেই দুই বৎসর আগে, তিনকড়ি মামারা যেদিন চলে গেলেন, সেইদিনই হ'বে কি তার পরদিনই হ'বে সন্ধ্যার পূর্ব্বে স্বামীজি আমায় ডেকে বল্লেন, মা সুশীলা, তোমার অবসর-সময়ের জন্য তো একটা ব্যবস্থা করতে হয়। আমি বল্লাম—বলুন। তিনি বল্লেন, বিকেলে তোমার অবসর-সময়ে, রাত্রির অন্ততঃ দ্বিতীয় যাম পর্য্যন্ত তোমার মনকে অধ্যয়নে নিরত রাখা উচিত। জ্ঞানানুশীলন ব্যতীত মানব-মনের বিকাশ ও পরিণতি লাভ হয় না। আমি বল্লুম—স্বামীজি, অধ্যয়ন এত বেশী করেছি যে তার জ্বালা এখনও ভুলতে পারি নি। স্বামীজি হেসে বল্লেন, অধ্যয়নের জ্বালা? এ যে নূতন কথা মা! জ্ঞানানুশীলনেই তো মনের সন্তাপ দূর হয়। আমি বল্লুম, তা হ'লে শুনুন স্বামীজি, আমার অধ্যয়নের কথা। কলিকাতায় আমার জন্ম। বাবা যথেষ্ট উপার্জ্জন করতেন। আমি তাঁর একমাত্র সন্তান। সুতরাং আমার বয়স যখন সাত বৎসর তখন ছোটখাটো মেয়ে-স্কুলে আমায় না দিয়ে বাবা আমায় বেথুনে ভর্ত্তি করে দিয়েছিলেন। সেখানে পাঁচ বৎসর পড়েছিলাম। এই পাঁচ বৎসরে অনেক কষ্টে চতুর্থ শ্রেণীতে উঠেছিলাম। বয়স তখন এই ১২।১৩ হ'বে। বাড়ীতে পড়াবার জন্য একটী ভদ্রলোক ছিলেন। তিনি একাধারে মাষ্টার ও পণ্ডিত। তিনি সন্ধ্যাবেলা পড়াতে এসে ব'লে যেতেন, আজ রাত্রে 'গো' শব্দের রূপটা মুখস্থ

করে রাখতেই হ'বে। আমি তখন 'গো' শব্দের রূপই মুখস্থ করব, না আমার পড়বার বইয়ের ডেস্কের মধ্যে লুকান 'কৃষ্ণকান্তের উইল' ই পড়ব? রোহিণী পুষ্করিণীতে জল আনতে যাচ্ছে, এই পর্য্যন্ত পড়বার পর মাষ্টার মশায়কে আসতে দেখে বইখানি লুকিয়েছিলাম, এখন 'গো' শব্দের রূপ আগে, না রোহিণী কি করল তাই আগে? অর্থাৎ—বিবাহ দিবার জন্য বাবা যখন আমাকে বেথুন থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে এলেন, তখন দুর্গেশনন্দিনী, বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল প্রভৃতি অনেক পুস্তক পড়া আমার শেষ হ'য়ে গিয়েছিল। এমন কি, এখন আর বলতে লজ্জা কি, ঐ ১৩ বৎসর বয়সের মধ্যেই হরিদাসের গুপ্তকথা পর্য্যন্ত গুলে খেয়ে ফেলেছিলুম। অধ্যয়ন কি কম করেছি স্বামীজি?

তারপর বিবাহ হ'ল। পাঁচ ছয় মাস যেতে-না-যেতেই না কি বিধবাও হ'লুম। সে কাহিনী এখন থাক। অধ্যয়নের কথাই বলি। বিধবা হ'বার পর, আপনি যেমন আজ বলছেন, তেমনই বাবাও বলেছিলেন মা সুশীলা, ভাগ্যে যা ছিল তা হয়ে গেল। এখন তুমি পড়াশুনা নিয়েই দিন কাটাবে। আপনার মত জ্ঞানানুশীলনের কথাটা তিনি বলেন নাই। তাঁর লাইব্রেরীতে অনেক বই ছিল। আমি গোগ্রাসে সেইগুলি চর্ব্বণ ও গলাধঃকরণ করতে লাগলাম। শুনলে আশ্চর্য্য বোধ করবেন স্বামীজি, আমার জ্ঞানানুশীলনের জন্য অধ্যয়ন তখন লণ্ডন রহস্য এবং ঐ রকম বই। তারই মধ্যে কঠোর ব্রহ্মচর্য্যের নিশানা খুঁজে বেড়িয়েছিলুম। তারপর, বাবার অবস্থা-বিপর্য্যয় হ'ল; আমি আর মা

কম্বুলিয়াটোলায় আশ্রয় পেলাম। সেখানে যে কয় মাস ছিলাম, সেই কয় মাস মাসীমাকে শোনাবার জন্তে একটু-আধটু রামায়ণ-মহাভারত পড়া ছাড়া তিনকড়ি-মামাদের কনসার্টপার্টির কল্যাণে থিয়েটারের নাটক ও বটতলার বই কি কম অধ্যয়ন করেছি স্বামীজি? এই এত পড়ায় আমার এমন বদহজম হ'য়েছিল যে, কাশীতে এক বামুনবাড়ী রাঁধুনিগিরি করবার সময় এবং সাজাহান-পুরে যে কিছুদিন ছিলাম, এই সময়ের মধ্যে আমি কোন বই স্পর্শও করি নি। এতদিনে যা অধ্যয়ন করেছি, তারই জ্বালা এখনও যে সাম্‌লাতে পাচ্ছি নি স্বামীজি; সুতরাং ও অধ্যয়ন আমাব দ্বারা হ'বে না।

স্বামীজি হেসে বললেন, সে কি অধ্যয়ন হয়েছে মা? সেই যে বিষ সংগ্রহ ক'রে এনেছ, এখন জ্ঞানানুশীলন ক'রে, ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করে সেই হলাহল দেহের অস্থি, মজ্জা, শিরা, ধমনী থেকে দূর করে ফেলতে হবে। শাস্ত্রানুশীলনের দ্বারাই তোমার হৃদয়ে অমৃত সঞ্চয় করতে হ'বে।

তাঁর কথার উত্তরে আমি স্পষ্ট বলেছিলাম,—সে বিষ আর অমৃতে পরিণত হ'বে না স্বামীজি! আপনার বৃথা চেষ্টা। আমি শাস্ত্রগ্রন্থ অধ্যয়ন করতে পারব না। তার চাইতেও বড় গ্রন্থ আপনি আমার সম্মুখে খুলে দিয়েছেন; দেখি সেই গ্রন্থ পাঠ করে আমি শান্তি লাভ করতে পারি কি না।

আমার সেইদিনের সেই কথা শুনে স্বামীজি ক্ষণকাল নিস্তব্ধ

থেকে হো হো ক'রে হেসে উঠে বলেছিলেন—যা বেটী, তোর আর শাস্ত্রানুশীলন করতে হ'বে না। তুই তোর সম্মুখে আনন্দময়ীর ব্রহ্মাণ্ড বেদ পেয়েছিস, তোর আর অন্য শিক্ষার দরকার নেই।

আজ তাই এতদিন পরে মনে হচ্ছে এমন পণ্ডিত—এমন বিচক্ষণ স্বামীজিরও ভুল হয়ে গেল! আমি ব্রহ্মাণ্ড-বেদও পাই নি, কুষ্মাণ্ড-বেদও পাই নি। আমি আমার বিগত জীবন-বেদ দিনরাত্রি আলোচনা করে একেবারে পথহারা হ'য়ে পড়েছি। এতদিন যে সব কথা কখনও মনে হয় নি, এখন সেই অতীত স্মৃতিরই রোমন্থন কচ্ছি। এ সমুদ্রমন্থনে অমৃত তো উঠবে না, প্রাণঘাতী গরল উঠবে, এ আমি বেশ দেখতে পাচ্ছি। তাই আমার নির্জ্জন কুটীরের অন্ধকারের মধ্যে বসে কত চীৎকার করেছি—আলো—আলো—আরো আলো। কোথায় আলো? অন্ধকারের সমুদ্র আমাকে ঘিরে ফেলেছে।

চার

এই কয়দিন আগে, কি একটা উপলক্ষে আশ্রমবাসী বিদ্যার্থী-দিগের অনধ্যায় ছিল; শুধু অনধ্যায় নয়, সারাদিন উপবাসেরও ব্যবস্থা হয়েছিল। স্বামীজির আদেশ নিয়ে সেদিন খুব ভোরে একদল ব্রহ্মচারী লছমনঝোলার দিকে চলে গেলেন, কয়েকজন গেলেন পদব্রজে দেরাদুনের দিকে, কেউ বা বনে-জঙ্গলে সারাদিন কাটাবেন ব'লে বে'র হয়েছিলেন। গেলেন না শুধু স্বামীজী, সেদিন তিনি ধ্যান-ধারণায় অতিবাহিত করবেন স্থির করেছিলেন; আর গেলেন না আত্মানন্দ, তিনি সে দিনটা একেবারে হাত-পা ছেড়ে অলসভাবে কাটাবেন। তাঁর এই সঙ্কল্পই সবার চাইতে ভাল বলে আমার কাছে মনে হয়েছিল; কারণ, তিনি যাই বলুন, অলসভাবে দিন কাটাবার মত ব্রহ্মচারী তিনি ছিলেন না, তা আমি বেশ জানতাম। আমি বুঝতে পারতাম, মধ্যে মধ্যে তিনি এই ভাবে পড়াশুনা বন্ধ রেখে সারাদিন যোগমগ্ন থাকতেন। আশ্রমে যখন কোন কাজ-কর্ম্ম নেই, তখন আমারও অবকাশ; অনধ্যায়ের বালাই ত আমার নেই। উপবাস—সে ত আমার লেগেই আছে।

সেদিন সকালে যথারীতি গঙ্গাস্নান শেষ ক'রে-এসে আমি আশ্রমের বাগান নিয়ে পড়লাম। এই বিস্তীর্ণ উদ্যান যে আশ্রমের ভাণ্ডার! এই ভাণ্ডার থেকে ফুল তুলে এনে পূজার আয়োজন

হয়। এই আশ্রমের তৃণগুল্ম আশ্রমবাসীদিগের অন্নের উপকরণ সংগ্রহ করে দেয়। এই আশ্রম-সংলগ্ন শস্যক্ষেত্র অকাতরে আশ্রম-ভাণ্ডারকে পূর্ণ ক'রে রাখে। এ সকলের তত্ত্বাবধানের ভার কয়েকজন সন্ন্যাসীর উপর দেওয়া আছে। তাঁদের আজ ছুটী। আমি স্বেচ্ছায় পরমানন্দে আজ এই উদ্ভিদ-জগতের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। মহানন্দে দিনের তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত কেটে গেল। তারপর আবার গঙ্গাস্নান ক'রে যখন আমার কুটীরে ফিরছি, তখন আমার কুটীরের অনতিদূরে এক বৃক্ষতলে আত্মানন্দস্বামী ভূমিশয্যায় হাত-পা ছড়িয়ে দিয়ে চোখ বুজে প'ড়ে আছেন,—যোগমগ্ন, কি ধ্যানমগ্ন, তিনিই জানেন।

আমি যখন তাঁর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন আমার পায়ের শব্দ পেয়ে হো'ক, বা অকস্মাৎ ধ্যানভঙ্গ হ'য়েই হো'ক, উঠে বস্‌লেন এবং আমার দিকে চেয়ে বল্‌লেন, এমন অসময়ে স্নান ?

আমি বল্‌লাম, স্নানের বা যোগধ্যানের সময় অসময় আছে কি স্বামীজি ?

স্বামীজি বল্‌লেন, সারাদিন কোথায় ছিলে ?

আমি বল্‌লাম, কৈ, সে খোঁজ ত কোনদিন করেন নাই ?

আত্মানন্দ বল্‌লেন অন্য দিন ত বাঁধা নিয়মের কাজ, তার আর অনুসন্ধানের প্রয়োজন হয় না। আজ অবকাশ কি না, তাই জিজ্ঞাসা করছিলাম।

আমি বল্‌লাম, আজ জীব-জগৎ ছেড়ে উদ্ভিদ-জগতে প্রবেশ

করেছিলাম। জীবের সঙ্গ অপেক্ষা উদ্ভিদের সঙ্গ অধিক লোভনীয়; শুধু লোভনীয় নয়, অধিক প্রার্থনীয়। তা সে সব তত্ত্ব-কথা থাক। একবার উঠুন না স্বামীজি, আমার কুটীর-প্রাঙ্গণের বৃক্ষতলে আসন ক'রে দিই। সেখানে ব'সে আমাকে গোটাকয়েক তত্ত্বকথা শোনান না প্রভু!

আত্মানন্দ সহাস্যমুখে বললেন, তত্ত্বকথা শোনাবার স্পর্দ্ধা নিয়ে এ স্থান থেকে আত্মানন্দ এক পাও নড়ছেন না। তোমার উদ্ভিদ-জগতের কোন নূতন তথ্য যদি শোনাবার থাকে তবে দেবী, অগ্রসর হও। তোমার বস্ত্র-পরিবর্ত্তন হ'লেই আমি তোমার বৃক্ষমূলে উপস্থিত হব।

বেশ, তাই আসুন। আমিই না হয় আজ গোটাকয়েক কটু কথা শোনাবো।

আত্মানন্দ সহাস্যে বললেন কটু কথা! এ যে অমৃত পরিবেশন! সে বেশ হবে, পরম উপাদেয় হবে।

আমি কুটীরে গিয়ে প্রবেশ করলাম। একটু পরেই শুনতে পেলাম আত্মানন্দ বলছেন, কাল যে অতীত হয়ে যায়।

আমি কুটীরমধ্যে আর অপেক্ষা না ক'রে বেরিয়ে এলাম। আত্মানন্দ বললেন, কৈ, তুমি ত ভিজে কাপড় ছাড় নাই?

আমি বললাম, শুকনো কাপড়, শুধু কাপড় কেন, শুকনো কিছুই আমার ভাল লাগে না স্বামীজি! আপনাদের আশ্রমে এসে তাই আমি প্রায় সর্ব্বদাই ভিজে কাপড়ে থাকি; এতে বেশ স্নিগ্ধতা উপভোগ করি। দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বসুন ঐ

ভূমিশয্যায়। আমার কুটীরে কোন আসন নেই, তা ত আপনি জানেন।

আত্মানন্দ সেই প্রস্তর-গ্রথিত বৃক্ষবেদীমূলে বস্‌লেন, আমিও তাঁর অদূরে ব'সে পড়লাম।

তারপর? তারপর প্রায় দশ মিনিট দু'জনেই নীরব। আত্মানন্দ কি ভাবছিলেন, তিনিই জানেন। আমি ভাবছিলাম, কি বলি? আত্মানন্দের কাছে বলবার অনেক কথা আছে, তাঁর কাছ থেকে জান্‌বার অনেক কথা আছে। কিন্তু কোন্‌টা রেখে কোন্‌টা আগে বলি, এই হ'য়ে পড়ল কঠিন সমস্যা। যদি বা মনে করি, এই কথাটাই আগে তুলি, অমনি মনের মধ্য থেকে আর একজন তাকে ঠেলে ফেলে এগিয়ে আসে।

এইভাবে প্রায় দশ মিনিট চ'লে গেলে আমি এক অদ্ভুত প্রশ্ন করে বস্‌লাম, আচ্ছা স্বামীজি, আপনাদের এই যে সব সাধন-ভজন অধ্যয়ন-অধ্যাপনা, এ-সব কিসের জন্য?

এমন প্রশ্ন বুঝি স্বামীজি কখনও শোনেন নাই, আমার কাছ থেকে আশাও করেন নাই। তিনি বিপুল বিস্ময়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

এই প্রশ্নটা এমনভাবে যে আমি করব, তা আমার মনেও কখন উদিত হয় নাই। একটু ভেবে-চিন্তে গুছিয়ে গাছিয়ে, ধীরে ধীরে যদি কথাটা বলতাম, তা হ'লে আত্মানন্দস্বামী এমন বিহ্বল, এমন বিব্রত হ'য়ে পড়তেন না। এমন কথা যে তিনি আমার মুখ দিয়ে উচ্চারিত হ'তে শুনবেন, এ কথা তিনি

আশাও করতে পারেন নাই। এত কঠোর অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের পর, এই সুদীর্ঘ দুই বৎসর তাঁদের সাহচর্য্য লাভ ক'রে, পরম পবিত্রচেতা মহাপণ্ডিত স্বামী অচলানন্দের অতুলনীয় স্নেহের অধিকারিণী হয়ে, এখন কি না প্রশ্ন করছি, আপনাদের এ সাধন-ভজন, এ অধ্যয়ন-অধ্যাপনা কিসের জন্য?

তাই উদার হৃদয়, নির্ম্মল-চরিত্র, জ্ঞান গরিষ্ঠ স্বামী আত্মানন্দ বিমূঢ়ভাবে আমার দিকে চেয়ে রইলেন; একটা কথাও বলতে পারলেন না; তাঁর ক্ষুরধার বুদ্ধি, তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য, অনন্যসাধারণ প্রতিভা তাঁকে কিছুক্ষণের জন্য যেন দিশেহারা ক'রে দিল।

তারপর নিজেকে সংবৃত ক'রে অতি ধীরভাবে তিনি বল্‌লেন, মা সুশীলা, বৃথাই কি এতদিন শাস্ত্রালোচনা করলাম, বৃথাই কি এতদিন কঠোর ব্রহ্মচর্য্য পালন করলাম! তুমি যে এই ভাবে অনুসন্ধান করছ, তা আমার দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি মা! কিন্তু, এত শীঘ্রই যে তুমি একটা ঠিকানায় পৌঁছবার জন্য, তোমার গন্তব্য পথে অগ্রসর হ'বার জন্য ব্যাকুল হবে, এইটাই আমি ধরতে পারিনি। তাই, বিস্ময়-বিমূঢ় হ'য়ে তোমার মুখের দিকে চেয়ে ছিলাম। তোমার প্রশ্নের উত্তর আমি দেব না, ইচ্ছে করেই দেব না। কাশী থেকে আরম্ভ করে আজ পর্য্যন্ত আমি প্রতিদিন তোমার মুখের ভাব লক্ষ্য করে এসেছি; তোমার চিন্তা, তোমার মন যে কি সব সমস্যা সমাধানের জন্য অহর্নিশ ব্যাপৃত, তোমার মুখে আমি প্রতিদিন তার রিকাশ

দেখেছি। অন্ধকার রাত্রিতে এই গাছের তলায় ব'সে তুমি যে কি ভাবে, কি চিন্তায় তন্ময় হ'য়ে কাটিয়েছ, তা কি আমার দৃষ্টি অতিক্রম করতে পেরেছে ব'লে তুমি মনে কর? ক্ষমা কর়ো মা, বেদান্তের, ধর্ম্মশাস্ত্রের আলোচনায় জীবনের এতকাল কাটিয়েছি। জীবনে কোন দিন কোন রমণীর সাহচর্য্য প্রার্থনা করি নি। অকস্মাৎ ধূমকেতুর মত কাশীর আশ্রমে তোমার আবির্ভাব হ'ল। আমার অপঠিত এক মহা-শাস্ত্রের পৃষ্ঠা আমার সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হ'ল। আমি অপার বিস্ময়ে এই শাস্ত্র অধ্যয়ন আরম্ভ করলাম। জগজ্জননীর হৃদয়ের বিচিত্র লীলাভঙ্গী আমাকে এক নূতন জগতে নিয়ে গেল। তারপর কাশীর আশ্রম কেন ত্যাগ করেছিলাম, তা সেই সময়ই তোমাকে বলেছিলাম। তোমাকে আমার সতর্ক দৃষ্টির বাহিরে রাখতে আমার মন যায় নি; কিন্তু কি করব, তোমাকে আরও সংগ্রাম করতে হবে, আরও পোড় খেতে হবে। তাই ভেবেই আমি চ'লে এসেছিলাম। এখানে এসে সব কথা গুরুদেবকে বলেছিলাম। তিনি আশ্বাস দিয়েছিলেন, যথাসময়ে তোমাকে এখানে নিয়ে আসবার ব্যবস্থা তিনিই করে দেবেন। তোমাকে যে এ আশ্রমে ধরে রাখতে পারবো না, তোমার পথ যে আমাদের পথ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক, সে কথা ত গুরুদেব সকলের সম্মুখেই বলেছিলেন; আমিও যে তা বুঝতে পেরেছিলাম। সেই থেকে তোমার গতিপথ কোন্ দিকে, তা আমি পর্য্যবেক্ষণ করে আস্‌ছিলাম। কিন্তু মা, তোমার এই দ্রুত বেগের সঙ্গে

আমি চলতে পারি নি; তুমি অনেক এগিয়ে এসেছ। তাই আজ তোমার প্রশ্নে আমি স্তম্ভিত হয়ে ভাবছিলাম—এত শীঘ্র, এত শীঘ্র! হয়েছে তোমার প্রশ্নের উত্তর-দান। প্রশ্ন আর ক'র না মা! উদ্‌ঘাটিত কর তোমার মহিমময়ী হৃদয়! বল, তুমি কি বলবে।

আত্মানন্দস্বামী যতক্ষণ কথা বলছিলেন, আমি ততক্ষণ তাঁর মুখের দিকে চেয়ে ছিলাম; তাঁর সকল সুন্দর কথায় যে অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ প্রকাশ হচ্ছিল, তাই আমি দেখছিলাম। তিনি যখন নীরব হ'লেন, আমি তখন বললাম, স্বামীজি, কি কথা জিজ্ঞাসা করতে গিয়ে কি কথা ব'লে ফেলেছি। এ-কথা না জিজ্ঞাসা করলেও হ'ত। কিন্তু যখন ব'লে ফেলেছি, তখন খুলেই বলি।

তার আগে কিন্তু আর একটা কথা ব'লে নিতে হচ্ছে। এই যে ব্রহ্মচারী, স্বামী, মহারাজ, আপনি, মশাই—এ সব পোষাকী সম্বোধন আর তোমাকে করতে পারছিনে, কেমন যেন দূর দূর ঠেকে। আজ থেকে,—এই এখন থেকেই ও-সব ভদ্রতা টেনে ফেলে দিয়ে 'তুমি' ব'লে সম্বোধন করি; ওতে প্রাণের ভিতর থেকে সাড়া আসে; 'আপনি' 'মশাই' এরা বাহিরে গড়াগড়ি যায়।

আর একটা কথা। তোমাকে আমি আত্মানন্দ ব'লে ডাকতে পারব না। ও নাম শুন্‌লেই আমার কত কথা মনে হয়। যাক্, সে কথা এখনই হ'বে। আমি এই এতদিন তোমাদের সঙ্গে থেকে, তোমাদের এই ধরাবাঁধা বিধি-ব্যবস্থা—

অনুষ্ঠান-আয়োজন, এই যে কর্ত্তব্যের কঠোর অনুশাসন, এই দুই বৎসর এ-সব আমাকে পীড়া দিয়েছে। অবশ্য আমি এ সকল অনুষ্ঠানের বাইরে ছিলাম। কিন্তু, তোমাদের এই-সব আচার-অনুষ্ঠান দেখে আমার প্রাণে ভারী বেদনা-বোধ হ'ত। এই যে প্রাতঃকালে গঙ্গাস্নান ক'রে এসে প্রতিদিন সকলে মিলে স্তোত্রপাঠ কর, আমি কাণ পেতে শুনেছি; অনুভব করেছি, তার সঙ্গে তোমাদের প্রাণের কোন যোগ নেই। তোমরা পিঞ্জরাবদ্ধ পাখীর মত যে বুলি শিখেছ, তাই উচ্চারণ করে যাও। কারও প্রাণ এতে স্পর্শ করে না, এ আমি বেশ দেখেছি। এ কেন? এই জড়মন্ত্রের সাহায্যে তোমরা কি সাধনপথে এক পাও অগ্রসর হ'তে পারবে, না, পেরেছ? আমিও তো প্রতিদিন তোমাদের স্তবগাথা শুনি, শুন্‌তে শুন্‌তে মুখস্তও হ'য়ে গিয়েছে; কিন্তু একদিনও ঐ গাথা আবৃত্তি করবার জন্য প্রাণের মধ্যে একটুও সাড়া পেলাম না। বলবে, এ আমার দুর্ভাগ্য। আমি সে কথা সম্পূর্ণ অস্বীকার করি। তোমাদেরই দুর্ভাগ্য,—তাই তোমরা এই আচার-অনুষ্ঠান, এই প্রাণের সহিত যোগ-সম্পর্কহীন ক্রিয়াকলাপের নিষ্করুণ চাপে পড়ে দিন দিন কেমন হ'য়ে যাচ্ছ। এই যে তোমাদের সকলেরই নামের সঙ্গে সঙ্গে একটা একটা আনন্দ,—কেউ আত্মানন্দ, কেউ বিনাশানন্দ, কেউ অদ্বৈতানন্দ, এই যে সব আনন্দের বোঝা ঘাড়ে ক'রে বেড়াচ্ছ—জিজ্ঞাসা করি তোমাদের এই ক্রিয়াকলাপ —তোমাদের এই আচার-অনুষ্ঠান—তোমাদের এই অধ্যয়ন-

অধ্যাপনা, তোমাদের এই বেদান্ত-তত্ত্বের মীমাংসা, এর মধ্যে কোথাও কি শ্রীমান্ স্বামী আত্মানন্দজি, আনন্দের জন্য একটুও ফাঁক রেখেছ? যে আনন্দধারা জগৎময় বয়ে যাচ্ছে, যে আনন্দে স্নাত হ'য়ে কত দীন অসহায় নরনারী কৃতার্থ হ'য়ে যাচ্ছে, তা তোমরা উপভোগ করছ না। তোমরা কি করছ? তোমরা সেই বিশ্বব্যাপী আনন্দ-প্রবাহের তীরে দাঁড়িয়ে শাস্ত্রের কূটার্থ আলোচনা করছ। কোনও দিন তোমাদের জীর্ণ শীর্ণ মুখে একটুও যদি আনন্দের জ্যোতিঃ দেখতে পেতাম, আমার প্রাণে আশা সঞ্চার হ'ত। সন্ন্যাসি! আমি আনন্দের পিয়াসী, আমি আনন্দে ভেসে যেতে চাই। তোমরা আমাকে ভুল বুঝো না। সংসারের মায়া-মোহ—সুখ দুঃখ—অভাব-অভিযোগ সেই আনন্দ-বাজারের পণ্য। তোমরা সেখানে যাবে? না তোমরা এই আশ্রমেই থাক্‌বে। থেকে কি করবে জান্‌তে চাই না। কিন্তু এই আনন্দহীন ক্রিয়াকলাপ আমার অসহ্য হ'য়ে পড়েছে। আবার বলছি আত্মানন্দ, আমাকে ভুল বুঝো না। তোমরা বলবে, আমার মন প্রবৃত্তির দাসত্ব করছে। আমি তা অস্বীকার করব না। আমি এই দুই বছর ভেবে দেখেছি, নিবৃত্তি আমার জন্য নয়। আমি কঠোরতার বিরোধী। আমি চাই আনন্দের ভিতর দিয়ে আনন্দময়ীকে দেখতে পেতে। তাই দুঃখ ক'র না সন্ন্যাসি! তোমাদের সংসর্গ আমি ত্যাগ করব। আমি সংসারে ফিরে যাব।

আমাকে বাধা দিয়ে আত্মানন্দ বললেন, সে ত তোমাকে

যেতেই হ'বে। এ যে তোমার স্থান নয়—এ যে তোমার পথ নয়, সে ত গুরুদেব জানেন, আর আমিও জানি; সে কথা তো এই একটু আগেও তোমায় বলেছি। কিন্তু কিছু মনে ক'র না সুশীলা, আমি তোমার একটী কথা অবনত-মস্তকে মেনে নিতে পারছি না। শাস্ত্রচর্চ্চায় আনন্দ নেই, জ্ঞানানুশীলনে আনন্দ নেই, এ-কথা ব'ল না সন্ন্যাসিনি!

আমি বল্লাম, তোমার সঙ্গে তর্ক করব না সন্ন্যাসি! তুমি যে আনন্দের কথা বললে, কয়জনের তা ভোগে লাগে জানি না। আমার জন্য তা ব্যবস্থিত হয় নি। আর মনের কথা খুলে বলব কি, তোমাকেও এ পথে চলতে দিতে আমার প্রাণ চাইছে না। তোমার গুরুদত্ত নাম আত্মানন্দ ভুলিয়ে দিয়ে তোমাকে শুধু আনন্দ বলে ডেকে, আনন্দের পশরা তোমার মাথায় তুলে দিয়ে তোমাকে নিয়ে ভবের হাটে যেতে ইচ্ছে করে। তুমি যাও আর না যাও, তুমি তোমার ঐ বেদান্তের মধ্যেই জীবনের সার্থকতার মধ্যে ব্যাপৃত থাক, বাধা দেব না। তা হ'লেও আজ থেকে তোমাকে আমি আনন্দ বলে ডাকব। আবার বলছি, আনন্দ, আমাকে ভুল বুঝ না। তোমার পাণ্ডিত্যে—তোমার অনুপম রূপে—তোমার অনাবিল সরলতায় মুগ্ধ হ'য়ে আমি তোমাকে আমার প্রবৃত্তির সহচর হ'তে বলছি না, কোনদিনও ব'লব না। আমি সে পথের সঙ্গে চিরজীবন যুদ্ধ ঘোষণা করব। কিন্তু জান কি আনন্দ, আমার জীবনের প্রথম ভাগ কি ভাবে অতিবাহিত হয়েছিল। সেইখানেই

কামনার—লালসার—প্রবৃত্তির যে বীজ উপ্ত হয়েছিল, আমি তা'কে সমূলে উৎপাটিত করবার জন্য এই সুদীর্ঘ কাল চেষ্টা করেছি। প্রাণপণে চেষ্টা করেছি—এবং আজ অসঙ্কোচে তোমার কাছে সে কথা স্বীকার করছি। শোন আনন্দ, কিছু ঢেকে রাখব না—প্রথম যখন কলিকাতার বাড়ী থেকে পালিয়ে আসি, সে কি প্রবৃত্তির তাড়নায়? সে কি লালসার আহ্বানে? না—না—না, আনন্দ, তা নয়। প্রবৃত্তির তাড়নায়—লালসার আহ্বানে যদি পালাতাম, তা হ'লে যোগেশের সঙ্গেই ত ভেসে যেতাম। তা করিনি, তা করতে পারিনি। তারপর প্রবৃত্তির, লালসার কত প্রলোভন আমার সম্মুখে উপস্থিত হয়েছিল, তা ত তুমি জান আনন্দ। কত অত্যাচার আমি বুক পেতে নিয়েছি। সে আমার বৈধব্যকে অম্লান রাখবার জন্য নয়। আমি আমার বৈধব্যকে জীবনের কোন অংশেই স্থান দিই নি। আমার অপরাধ কি জান আনন্দ? আমি আমার দেবীস্বরূপিণী মাতৃ-মনে কষ্ট দিয়েছিলাম, মাতৃদ্রোহী হয়েছিলাম। সেই আমার মহাপরাধ। সেই অপরাধের কঠোর প্রায়শ্চিত্ত আমি করেছি—আরও করতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু ঐ যে বলেছি আনন্দ, প্রবৃত্তিকে আমি সমূলে উৎপাটিত করতে পারিনি। স্বামীজি আমাকে যে কঠোর ব্রহ্মচর্য্য সাধনের আদেশ দিয়েছিলেন, তা আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছি। কঠোরতার মাত্রা বাড়িয়েছি ভিন্ন কমাইনি। কিন্তু তার কি ফল হ'ল, তোমার সম্মুখেই তা দেখতে পাচ্ছ। ব্রহ্মচর্য্যের ফলে আমার শরীর

দুর্ব্বল হয়ে যাবে—প্রবৃত্তি নিস্তেজ ও নিষ্পীড়িত হ'য়ে যাবে। এই ত এই ব্রহ্মচর্য্যের উদ্দেশ্য। তা ত হ'ল না আনন্দ! এই কঠোর ব্রহ্মচর্য্যের ফলে আমার শরীর স্বাস্থ্যবতী হয়েছে—বলতে লজ্জা করে আমার যৌবন শতদলে প্রস্ফুটিত হয়েছে। তারপর ?

তারপর আমাকে বাধা দিয়ে আনন্দ বল্লেন—দেবী, তোমার এতগুলো কথার উত্তর দেবার শক্তি আমার নেই। আমি এতকাল যে শিক্ষা লাভ করেছি, যে সামান্য অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি, তার মধ্যে তোমার এই সব প্রশ্নের, তোমার মনের এই সব ভাবের অভিব্যক্তির কোন হেতু আমি খুঁজে পাচ্ছিনে। আমি শিক্ষার্থী। কিন্তু, তুমি যে সব শিক্ষার কথা বললে, তার আলোচনা করবার সাধ্য আমার নেই। এতদিন ও-সব কথা আমার মনেও আসেনি। আমি আজীবন, আমরণ শাস্ত্রাধ্যয়ন করব, এই আমার বাসনা—এই আমার সঙ্কল্প। তোমাকে আমি শ্রদ্ধা করি, তোমার মঙ্গলের জন্য স্বামীজি যা আদেশ করেছেন, তা আমি পালন করেছি—ভবিষ্যতেও তাঁর আদেশই, তাঁর অনুশাসনেই আমার কার্য্য নিয়ন্ত্রিত হবে। তবে তোমাকে এই কথাটা বিশেষ দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে চাই যে, তুমি তোমার জীবন-পথে নিজের বুদ্ধি-বিবেচনার উপর একমাত্র নির্ভর করে চ'ল না ; তাতে তোমার পথভ্রষ্ট হওয়া বিচিত্র নয় ; তোমার জীবন হয় ত তা'তে বিপদসঙ্কুল হ'তে পারে। আর তা কি হয়নি তোমার জীবনে, ভেবে দেখ দেখি ?

আমি বললাম, আনন্দ, আমার বয়স বেশী হয় নাই; কিন্তু এই বয়সেই আমি যে কত বিপদ, কত প্রলোভনের সম্মুখীন হয়েছি, তা তুমি জান আনন্দ! আর সেই সব বিপদ আমি কেমন করে কাটিয়ে উঠেছি, সেই সব প্রলোভন কেমন করে জয় করেছি, তাও ত তুমি জান আনন্দ!

আনন্দ আমার কথায় বাধা দিয়ে বলল, ক্ষমা কর সুশীলা, তোমার এ কথা কয়টী আমি ঠিক মেনে নিতে পারছিনে। তোমার সব বিপদ কেটে গেছে, প্রলোভন তোমাকে জয় করতে পারেনি, এ সকলই সত্য কথা। কিন্তু তুমি বিপদ কাটিয়েছ, তুমি প্রলোভন জয় করেছ—এমন কথা ব'ল না। তুমি কিছুই করনি সুশীলা, তোমার কিছুই করবার শক্তি ছিল না—এখনও নেই।

পিছন থেকে জলদ-গম্ভীর স্বরে ধ্বনি উঠল—আছে—আছে আত্মানন্দ—আছে।

আমরা ভীতি-বিহ্বল হ'য়ে পিছনে চেয়ে দেখলাম, স্বামী অচলানন্দ আমাদের পিছনে দাঁড়িয়ে আছেন; এ বাণী তাঁরই মুখ-নিঃসৃত।

আমরা তাড়াতাড়ি উঠতে যাচ্ছি দেখে স্বামীজি বললেন, না, না, তোমরা উঠো না, ব'সে থাক। আমি এই একটু আগেই এইদিকে বেড়াতে এসে দেখলাম তোমরা দু'জনে কি নিয়ে আলোচনা করছ, আর সেই আলোচনায় তোমরা এমন তন্ময় হয়ে গিয়েছ যে, অন্য দিকে চাইবারও তোমাদের অবকাশ হয় নি।

আমার ভারী কৌতূহল হ'ল তোমাদের বাদানুবাদ শুন্‌বার। তাই তোমাদের অলক্ষিতে পিছনে এসে তোমাদের কথা শুন্‌ছিলাম। কিন্তু, তুমি আত্মানন্দ, যখন বললে যে, সুশীলার কিছু করবারই শক্তি নেই, ছিল না, তখন আমি সে কথার প্রতিবাদ না ক'রে পারলাম না আত্মানন্দ! তোমার কথার উদ্দেশ্য আমি বুঝতে পেরেছি। তুমি বলতে চাচ্ছিলে যে, 'আমি এটা করেছি' 'আমি ওটা করেছি' এর দ্বারা 'অহং'-জ্ঞানের প্রশ্রয় দেওয়া হয় এবং সেটা ভাল নয়। কেমন, এই ত তোমার বক্তব্য ?

আনন্দ এ কথার কোন উত্তর দিল না, স্বামীজির সহিত বাদানুবাদ সে কখনই করে না। স্বামীজির এ কথার উত্তর আমিই দিলাম; বললাম, আমি কিন্তু অহঙ্কার ক'রে ও-কথা বলিনি—'আমি প্রলোভন জয় করেছি' এ-কথা আমি সাধারণ ভাবেই বলেছি। আত্ম-কর্তৃত্ব-স্থাপন আমার উদ্দেশ্য নয়, আমি তা ভাবিও নি। আমি করেছি অর্থাৎ আমাকে উপলক্ষ্য ক'রে কাজটা হ'য়েছে; তা'তে আমার কৃতিত্ব কতখানি, সে কথা আমার মনেও আসেনি। আমি কে, আমি কতটুকু, আমার শক্তিসামর্থ্য কত অকিঞ্চিৎকর, তা আমি জানি। অলক্ষ্য থেকে একজন আমাকে বল দিয়েছিলেন; সেই বলে বলীয়ান্ হয়েই আমার জীবনের অনেক বাধা-বিঘ্ন কেটে গিয়েছে, এই কথাই আমি বলতে চেয়েছিলাম।

স্বামীজি সহাস্যমুখে বল্‌লেন, শুন্‌লে আত্মানন্দ, মায়ের কথা

শুন্‌লে। আমি যা বলতে যাচ্ছিলাম, সে কথা মায়ের মুখ দিয়েই বেরিয়ে এল। কিন্তু, ওটা ত আসল কথা নয়—আসল কথা হচ্ছে আনন্দ নিয়ে। আমাদের এই আশ্রমে সুশীলা আনন্দের সন্ধান পায়নি, তাই মা আনন্দময়ীর প্রাণ আকুল হয়েছে। তোমরা সকলে জ্ঞান-পথের পথিক আনন্দ। তা'তে যদি তোমরা তৃপ্তি না পেতে, তা হ'লে তোমরা ছুটে বেরিয়ে যেতে। সুশীলা তোমাদের এই শাস্ত্রালোচনার মধ্যে, এই জ্ঞান-চর্চ্চার মধ্যে কোন আনন্দের খোঁজ পায়নি। এতে তার অপরাধ হয় নি। পৃথিবীতে সকলের জন্যই একমাত্র পথ নির্দ্দিষ্ট হয় নি, হতে পারে না; বিভিন্ন প্রকৃতির জন্য বিভিন্ন পথ, এ আমি জানি সুশীলা। তাই, তুমি যখন সব ছেড়ে অবশিষ্ট জীবন আমার এই আশ্রমেই কাটাবে ব'লে সঙ্কল্প ক'রেছিলে, তখনই আমি বলেছিলাম, এ পথ তোমার জন্য নয়, তোমাকে সংসারে ফিরে যেতে হবে। আমি ভবিষ্যৎদর্শী নই, আমি তোমাদেরই একজন। তবে, আমি আমার অভিজ্ঞতার দাবী কিঞ্চিৎ করতে পারি। আর একটু পারি এই যে, আমি মানুষ চিন্‌তে পারি: মানুষকে দেখলেও চিন্‌তে পারি, মানুষের পরিচয় অপরের কাছে শুনলেও সে মানুষকে আমি প্রত্যক্ষ-দৃষ্টবৎ চিন্‌তে পারি। আত্মানন্দ, সুশীলা এখানে আসবার অনেক পূর্ব্বেই তোমার কাছে ওর কথা শুনে আমি ওকে চিনতে পেরেছিলাম, ওর শুভানুধ্যায়ী হয়েছিলাম। তাই শ্রীভগবানের কৃপায় ও আমাদের এই আশ্রমে আসতে পেরেছে। বল না মা সুশীলা, তুমি কি প্রতি পাদক্ষেপে, তোমার প্রত্যেক কার্য্যে কোন

অপ্রত্যক্ষ শক্তির সান্নিধ্য অনুভব কর নাই? কোথা থেকে তোমার মধ্যে অমিত বল, অনন্যসাধারণ তেজ সঞ্চারিত হ'ত, তা কি তুমি বুঝতে পার নাই? এ শক্তি, এ তেজ তুমি অর্জ্জন করেছ, এ তোমার প্রকৃতির সঙ্গে মিশে গিয়েছে, তার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। তাই আত্মানন্দের কথার প্রতিবাদে আমি বলেছিলাম 'আছে, আছে আত্মানন্দ, এ শক্তি আমার মায়ের আছে।' সেই শক্তির বলেই সুশীলা ওর তিনকড়িমামাকে, বড়মাসীকে হরেন্দ্রকে, রাণীকে টেনেছে,—তোমাকেও টেনেছে আত্মানন্দ,—আর আমি এই যে সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী, আমাকেও টেনেছে। এর পর আরও কত যে মা আমার টান্‌বে তা আমি দিব্যচক্ষে দেখতে পারছি।

এই বলেই একটু এগিয়ে এসে আমার পাশে বসে মাথায় হাত রেখে স্বামীজি বল্‌লেন, মা সুশীলা, তোমার কথা সব আমি শুনেছি, অবাক হয়ে শুনেছি। তোমার দিক দিয়ে যা বলা কর্ত্তব্য, তা তুমি একেবারে খুলে বলেছ। তুমি আনন্দের কাঙ্গালিনী। তা যে তোমাকে হ'তেই হবে; তুমি যে আনন্দময়ীর আদরের আদরিণী। তোমার কাছে এ সব শাস্ত্রানুশীলন, এ সব ক্রিয়াকলাপ যে নিতান্তই শুষ্ক বোধ হবে, এ যে মহাসত্য। দেখ, আমি যখন সংসারাশ্রমে ছিলাম, তোমার সুজলা সুফলা বাঙ্গলাদেশেরই অধিবাসী ছিলাম, তখন আমারই এক দেবোপম বন্ধুর মুখে একটা গান শুনেছিলাম। সেই গানটী আমার এতকাল পরে এখন মনে হচ্ছে। আমার

ধর্ম্মবন্ধু অশ্বিনীকুমার—বরিশালের দেবতা অশ্বিনী দত্ত একদিন গেয়েছিলেন—

'আমি তোর মুখ-ফুলানো ভগবানের ধার ধারিনে ভাই ;
আমার ঠাকুর হাসি-খুসি খেলায় ধূলোয় পাগল দেখ্‌তে পাই।
যেমন হাসি উঠলো ফুটে,
চৌদ্দ ভুবন এল ছুটে,
সৃষ্টি হল, সাড়া পেল, সবাই ধরলে তাই।
তাই তাই তাই চল্লো ভেসে,
ঠাকুর খুন হেসে হেসে
হাসির তরঙ্গ কত বলিহারী যাই।
প্রেমে সৃষ্টি গর গর (এ যে সব প্রেমের লীলা)
কাঁপে ভাবে থর থর,
তাল ধরলে ঠাকুর আমার, নাচিল সবাই।
(আবার) যাই ফুরুলো বাইরের খেলা,
ভেঙ্গে গেল মহা মেলা,
ঐ হাসিতে ডুবে গেল, সাড়া শব্দ নাই।
এ মজা ভাই দেখে দেখে,
আমিও ভাই থেকে থেকে,
সবাইয়ের সঙ্গে মিলে মিশে হাসি নাচি গাই।
যখন আসবে সময় যাবে বেলা
ফুরাবে এই ভবের খেলা,
ডুবে যাবে হাসির মাঝে, খিন খিন খিন তাই।

যারা মুখ ফুলিয়ে থাকে ভবে
তাদের বহুত দেরি হবে,
সবার সঙ্গে নাচা গাওয়া ভিন্ন পন্থা নাই।

অশ্বিনীকুমার তখন জ্ঞানের রাজ্য পার হয়ে গিয়ে ভূমানন্দের দিকে ছুটেছিল। তার কথা তখন মনে ধরে নি। আমি তখন জ্ঞান-পথের পথিক। তারপর এই এতকাল জ্ঞানমার্গে ভ্রমণ করছি। জ্ঞানচর্চ্চায়, শাস্ত্রানুশীলনে যে আনন্দ নেই, এ কথা আমি বলতে পারব না। আনন্দ আছে—বিশ্বাস কর মা সুশীলা, এই বৃদ্ধ সেবকের কথা বিশ্বাস কর—আনন্দ আছে। আমি সে আনন্দের সন্ধান পেয়েছি। কিন্তু, বড় কঠোর এ পথ, বহু সাধনা-সাপেক্ষ এ পথ। অশ্বিনীকুমার পেরিয়ে গেল—আমি চল্‌ছি। আজ তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে, তুমিও আনন্দের পথ পেয়েছ। কি সাধনা-বলে পেয়েছ তা আমি জানি। বলেছি, ভিন্ন ভিন্ন মানুষের পক্ষে ভিন্ন ভিন্ন পথ; বিশেষতঃ জানি রমণীর পক্ষে পথ আরও বিভিন্ন। জ্ঞানের পথ যে তাদের জন্য নয়, এমন কথা বলতে পারব না। কিন্তু, তোমার পক্ষে এ পথ প্রশস্ত নয়, তুমি এর মধ্যে আনন্দ পাবে না, এ আমি জানতাম। তাই আজ যখন তোমার মুখে শুনলাম, তুমি এ আশ্রমে আনন্দ পাচ্ছ না, তোমার প্রাণ আনন্দলাভের জন্য ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছে, তখন আমি বিস্মিত হই নি। এ যে আমি জানতাম। এই দুই বৎসর এরই জন্যই ত তোমাকে এখানে আটক করে রেখেছি। তোমার প্রাণে আনন্দময়ীর সান্নিধ্য লাভের জন্য, বিপুল ব্যাকুলতার জন্যই যে

আমি অপেক্ষা করেছিলাম। এই অজেয় বর্ম্মে আবৃত ক'রে তোমাকে সংসারে পাঠাব, আনন্দের হাট বসাবার জন্য, এই ত আমার উদ্দেশ্য ছিল। আজ তা সফল হয়েছে। আশীর্ব্বাদ করি, তোমার আনন্দের তরঙ্গে দেশ ভেসে যাক্ তোমার সাধনা সিদ্ধিলাভ করুক।

আমি স্বামীজির পদধূলি গ্রহণ করিলাম।

পাঁচ

(হরেন্দ্রের কথা)

অন্য বিবরণ বলবার আগে আমার পরিচয়টা দেওয়া কর্ত্তব্য মনে করছি।

আমার নাম শ্রীহরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। আমার বাবা এই কানপুরে ওকালতী করতেন। এখানেই আমার জন্ম। বাবার কাছে শুনেছি, আমাদের আদি নিবাস বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কালনায় ছিল। আমি কখনও সেখানে যাইনি, যদিও কলিকাতা মেডিকেল কলেজেই আমি পড়েছি এবং সেখান থেকেই এম-বি পাশ ক'রে কানপুরে এসে চিকিৎসা-ব্যবসায় আরম্ভ করেছি। কালনায় আমাদের জ্ঞাতিরা নাকি আছেন; আমিও তাঁদের চিনি না, তাঁরাও আমাদের চেনেন না—খোঁজ-খবরও নেন না। অর্থাৎ, সোজা কথায় আমরা পশ্চিমে বাঙ্গালী,—প্রবাসী বাঙ্গালী।

আমি যখন এম-বি পাশ ক'রে এই কানপুরে এলাম, তখন আমার বাবা এখানে ওকালতী করতেন; কাজেই নূতন ডাক্তার হ'লেও আমি এখানে অতি অল্পদিনের মধ্যেই এক-রকম পশার ক'রে নিয়েছিলাম। এই সময় আমাদেরই মত প্রবাসী বাঙ্গালী সাজাহানপুরের উকীল সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের একমাত্র কন্যা রাণীর সঙ্গে আমার বিবাহ হয়। এই বিবাহের মাস চারেক

পরেই আমার বাবা মারা যান ; মা মারা গিয়েছিলেন আমার বয়স যখন পনর বৎসর।

আরও দু'-চারটে কথা বলা দরকার। এই বছর চার আগে একবার এ অঞ্চলে ভয়ানক প্লেগ আরম্ভ হয়। আমাদের এই কানপুরে খুব বেশী না হ'লেও এ-দিকের অন্যান্য স্থানে প্লেগের এমন বাড়াবাড়ি হয় যে, অনেক শহরের লোক বাড়ী ছেড়ে পলায়ন করতে আরম্ভ করে। আমার শ্বশুরবাড়ী সাজাহানপুরেও সেই সময় ভয়ানক প্লেগ আরম্ভ হয়। আমার স্ত্রী তখন সাজাহানপুরে ছিল। তার কাছ থেকে সংবাদ পেয়ে আমি আমার শ্বশুরকে ঐ স্থান ত্যাগ করবার জন্য বিশেষ অনুরোধ ক'রে পত্র লিখি। তিনি অদৃষ্টের দোহাই দিয়ে আমার অনুরোধে সম্মত হ'ন নি। তারপরই একদিন তার পেলাম যে, তিনি প্লেগে আক্রান্ত হ'য়েছেন। সেই খবর পেয়েই আমি সাজাহানপুরে ছুটে যাই। তাঁকে সজ্ঞানেই দেখতে পেয়েছিলাম, কিন্তু বাঁচাতে পারলাম না।

সেই সময় তাঁর গ্রামবাসী বাল্যবন্ধু দীনেশবাবু, তাঁর স্ত্রী ও বিধবা কন্যা সুশীলা তাঁরই আশ্রয়ে ছিলেন। দীনেশবাবু কলিকাতায় কি একটা চাকরী করতেন। স্বভাব-চরিত্র বদ্ হওয়ায় আফিসের অনেক টাকা ভাঙ্গেন। সেই জন্য তাঁর দুই বৎসরের কারাদণ্ড হয়। সেই সময় আমার শ্বশুর সতীশবাবু দীনেশবাবুর কাছে প্রতিশ্রুত হ'ন যে, দীনেশবাবু যতদিন জেলে আবদ্ধ থাকবেন, ততদিন তাঁর স্ত্রী ও কন্যার ভরণ-পোষণ ও

তত্ত্বাবধান তিনি করবেন। আমি শুনেছিলাম যে, দীনেশবাবুর স্ত্রী ও কন্যা কিছুদিন কলিকাতার কম্বুলেটোলায় একজনের বাড়ীর দু'টা ঘর ভাড়া নিয়ে ছিলেন; আমার শ্বশুরই তাঁদের খরচ চালাতেন। কিন্তু এ ব্যবস্থা সতীশবাবুর মনের মত না হওয়ায় তিনি তাঁদের সাজাহানপুরে নিয়ে আস্‌বার জন্য নিজে কলিকাতায় যান। যে দিন যাত্রা করবার কথা, তার আগের দিনই দীনেশবাবুর বিধবা কন্যা সুশীলা নিরুদ্দেশ হন, তাঁর নাকি সাজাহানপুরে যাবার ইচ্ছা ছিল না। আমার শ্বশুর দীনেশবাবুর স্ত্রীকে সাজাহানপুরে এনে নিজের বাসাতেই রাখেন।

দীনেশবাবুর দণ্ডের কাল শেষ হ'লে যে-দিন সতীশবাবু নিজে কলিকাতায় গিয়ে তাঁকে সাজাহানপুরে নিয়ে আসেন, ঠিক সেই দিনই, দীনেশবাবুর স্ত্রী কলিকাতায় যাঁদের বাড়ীতে ছিলেন, সেই বাড়ীর তিনকড়ি নামক একটি যুবক আর তার বিধবা বড় বোন মৃতপ্রায়া সুশীলাকে নিয়ে সাজাহানপুরে উপস্থিত হ'ন। তাঁরা নাকি তীর্থ-ভ্রমণ উপলক্ষে কাশীতে এসে একদিন সন্ধ্যার পর একটা রাস্তার পাশে অজ্ঞান অবস্থায় সুশীলাকে পান। সুশীলার তখন বাঁচবার সম্ভাবনা ছিল না। সে একবার তার মাকে দেখতে চেয়েছিল। তাই তিনকড়ি আর তার দিদি সুশীলাকে সাজাহানপুরে নিয়ে আসে। সুশীলা যে কুপথে যায়নি, সে যে অনেক নির্য্যাতন সহ্য করেও তার সতীত্ব-ধর্ম্ম রক্ষা করেছে, ইত্যাদি সমস্ত কথা জানতে পেরে সতীশবাবু ও তাঁর স্ত্রী সুশীলাকে পরম স্নেহে ঘরে তুলে নেন। দীনেশবাবুও ওখানকার ডিষ্টিলারীতে

একটা চাকরী আরম্ভ করেন। এর কিছুদিন পরেই প্লেগে সতীশবাবু মারা যান এবং প্রাণপণে তাঁর সেবা করতে গিয়ে দীনেশবাবুর স্ত্রীও পরদিন ঐ রোগে মারা যান। আমি তখন সকলকে কানপুরে আনতে চাই। দীনেশবাবু তা'তে সম্মত হ'ন নি, কাজেই সুশীলারও আসা হয় না। তাঁরা ছোট একটা বাড়ী ভাড়া ক'রে সাজাহানপুরেই থাকেন। তিনকড়ি আর তার দিদিও ওঁদের কলিকাতায় নিয়ে যাবার জন্ম বিশেষ চেষ্টা করেও অকৃত-কার্য্য হ'ন। আমি আমার শাশুড়ী আর স্ত্রীকে নিয়ে কানপুরে চ'লে আসি। তার কয়েকমাস পরেই আমার ছেলে ভবশঙ্করের জন্ম হয়।

আর কিছুদিন পরেই কি জানি কেন দীনেশবাবু কাউকে কিছু না বলে এক রাত্রিতে সাজাহানপুর ছেড়ে কোথায় চ'লে যান; আরও আশ্চর্য্যের কথা এই যে, সেই রাত্রিতেই সুশীলাও সাজাহানপুর ত্যাগ করেন।

তারপর হঠাৎ একদিন তিনকড়ি আর তার দিদি কানপুরে আসেন। তাঁরা সুশীলার কাছ থেকে এক চিঠি পান যে, সে বিপন্না। সেই সংবাদ পেয়ে তাঁরা সাজাহানপুরে যান; কিন্তু তার আগেই দীনেশবাবুও কোথায় চ'লে গিয়েচেন, সুশীলারও কোন সন্ধান কেউ দিতে পারে নাই। তাঁরা তখন হরিদ্বারে গঙ্গাস্নান করতে যান। সেখানে অচলানন্দ স্বামীর আশ্রমে সন্ন্যাসিনী-বেশে সুশীলাকে পান। তাঁরা তাকে দেশে ফিরিয়ে আনতে অনেক চেষ্টা করেন; সুশীলা কিছুতেই সে প্রস্তাবে সম্মত হ'য় নি। তাঁরাই দেশে ফিরবার সময় এই সংবাদ কানপুরে আমাদের দিয়ে

যান। আমার শাশুড়ী ও আমার স্ত্রীর বিশেষ আগ্রহে আমরাও সুশীলাকে ও-পথ থেকে ফিরিয়ে আন্‌বার জন্য হরিদ্বারে যাই। আমার একমাত্র ছেলে ভবশঙ্করের মায়াতেও সুশীলা বদ্ধ হ'ল না—সে কিছুতেই আশ্রম ত্যাগ করতে সম্মত হ'ল না। আমরা নিরাশ হ'য়ে কানপুরে ফিরে এলাম। এ প্রায় দেড় বছর আগের কথা।

এইবার মূল কথা আরম্ভ করা যাক।



ছয়

কানপুরে এখন আমরা যে বাড়ীতে বাস করছি, এটা আমাদের নূতন বাড়ী। আগে আমাদের বাড়ী একেবারে শহরের মধ্যে ছিল। সে বাড়ীর অসুবিধা অনেক ছিল; ভাল আলো-বাতাস সে বাড়ীতে প্রবেশ করতে পারত না; গায়ে গায়ে বসতি ছিল। সেই জন্ম বাবা শহরের একপ্রান্তে অনেকখানি জমি নিয়ে আমাদের এই বাড়ীটা তৈরী করেছিলেন; আগের বাড়ীটা ভাড়া দেওয়া আছে। এ বাড়ীটা নিতান্ত ছোটও নয়, আর যে খুব বড় তাও নয়। বাড়ী ছোট হ'লেও চারপাশে অনেক জমি। বাবার বাগানের সখ খুব বেশী ছিল; তিনি অবসর-সময়ে নিজে বাগানে কাজ করতেন; সেই জন্ম বাড়ীর সম্মুখে ফুলের বাগান, দুই পাশে এবং পিছনে ফলের বাগান, শাক-সব্জীর বাগান তাঁরই যত্নে ও চেষ্টায় গড়ে উঠেছিল। বাবার এই বাগানের সখ উত্তরাধিকার সূত্রে আমিও পেয়েছি। আমিও প্রতিদিন এখনও বাগানে কাজ করি।

একদিন বিকেল বেলায় আমি বাগানের মধ্যে কতকগুলি নূতন ফুলের গাছ বসাচ্ছিলাম, আমার ছেলে ভবশঙ্কর আমার পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল, এমন সময় একখানি ভাড়াটে গাড়ী আমাদের বাড়ীর গেট দিয়ে ভিতরে এল। আমি মনে করলাম, হয় তো কোন রোগীর বাড়ী থেকে আমাকে কেউ ডাকতে এসেছে।

তাই আমি আর সে দিকে মনোযোগ না দিয়ে ফুলের গাছের তদারকেই নিবিষ্ট হ'লাম।

গাড়ীখানি আমাদের গাড়ী বারান্দায় গিয়ে থামতেই গৈরিক বসন্-পরা একজন সন্ন্যাসী নামলেন। তাই দেখে ভবশঙ্কর বলল, বাবা, ঐ দেখ কে এসেছে।

আমি মুখ তুলে চেয়ে দেখেই চিন্‌তে পারলাম, এ যে হরিদ্বারের স্বামী অচলানন্দের শিষ্য ব্রহ্মচারী আত্মানন্দ।

আমি তখন তাড়াতাড়ি গাড়ী-বারান্দার কাছে গিয়ে আত্মা-নন্দকে অভ্যর্থনা করতে উদ্যত হ'লে তিনি বললেন, হরেনবাবু, আগে গাড়ীর মধ্যে যিনি আছেন, তাঁকে অভ্যর্থনা করুন।

এই কথা বল্‌তে না বল্‌তেই গাড়ীর ভিতর থেকে সুশীলাদিদি নামলেন। আমি এগিয়ে গিয়ে বললাম, আমার এ কি সৌভাগ্য! ব্রহ্মচারিণীর পদধূলি আমার গরীবখানায়!

সুশীলাদিদি হেসে বল্‌লেন, ডাক্তারবাবু, দৃষ্টিশক্তি কি ক্ষীণ হয়েছে? কোথায় ব্রহ্মচারিণী! সে হরিদ্বারে গঙ্গায় ডুবে মরেছে—আমি আপনাদের সুশীলা।

আমাকে আর কথা বলতে হ'ল না; গাড়ী আসার শব্দ পেয়েই রাণী বাহিরের বারান্দায় এসেছিল। সুশীলাদিদিকে দেখেই দৌড়ে এসে তাঁকে জড়িয়ে ধরে বল্‌ল, দিদি, কি সৌভাগ্য!

সুশীলাদিদি রাণীর মুখচুম্বন করে বল্‌লেন, কর্ত্তা গিন্নী দুই-জনেরই এক কথা—সৌভাগ্য! সৌভাগ্য যে আমার। কিন্তু

যাকে দেখবার জন্য সেই হরিদ্বার থেকে ছুটে এসেছি, আমার সে নন্দদুলাল কৈ ?

এই ব'লে এদিক ওদিক চাইতেই একটু দূরে ভবশঙ্করকে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে, সুশীলা ছুটে গিয়ে তাকে বুকে তুলে নিয়ে বললেন, ওরে আমার সাত রাজার ধন মাণিক ! তোর জন্যই যে আমি এখানে এসেছি। এত দিনে আমার বুক জুড়িয়ে গেল রাণী, আমার বুক জুড়িয়ে গেল।

দেখতে দেখতে সেখানে আমার শাশুড়ীর আবির্ভাব। সুশীলা-দিদি ছেলে বুকে করেই নতজানু হ'য়ে তাঁর পায়ের ধূলো নিয়ে বললেন, কাকীমা, আমি বাড়ী এসেছি। আশ্রম থেকে তোমাদের ফিরিয়ে দিয়েছিলাম, সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে এসেছি।

আমার শাশুড়ী সুশীলাকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে বললেন, মাগো, তখন তুমি সুশীলা ছিলে না, তখন যে ব্রহ্মচারিণী, তাই আমাদের মায়া কাটিয়েছিলে। কিন্তু, আশ্রম থেকে ফিরবার সময় আমি হরেনকে বলেছিলাম, আমার সুশীলা আবার আমার কাছে আসবে। মনে আছে হরেন, আমি এ কথা বলি নি।

সুশীলাদিদি বললেন, কাকীমা, তোমার কথা কি বিফল হয়। তাই দেখছ না, তোমার মেয়ে তোমার কোলে এসেছে। আর এনেছেন কে জান কাকীমা, এই বেটা যাদুকর। এই ব'লে সুশীলা ভবশঙ্করের মুখ চুম্বন করলেন। আর ছেলেও এমনি যে, একটু আপত্তিও করল না ; পরম আনন্দে সুশীলা-দিদির বুকে নিজের আসন প্রতিষ্ঠিত করে নিল।

ব'লে উঠল, তোমরা বেশ ত। স্বামীজিকে যে কেউই অভ্যর্থনা করলে না। স্বামীজি, মনে কিছু করবেন না, দিদিকে পেয়ে আমরা একেবারে আনন্দে আত্মহারা হয়েছিলাম।

আত্মানন্দ সহাস্যমুখে বল্‌লেন, এই দৃশ্যই আমি মানস-নেত্রে কল্পনা করতে করতে এসেছিলাম। মা আনন্দময়ী, এই ত তুমি আনন্দের হাট বসিয়ে নিলে; এখানে নিরানন্দময়, কঠোর বৈদান্তিক আনন্দের স্থান ত নেই মা!

আত্মানন্দ দুই হাত উর্দ্ধে তুলে কার উদ্দেশে যেন নমস্কার করলেন; তারপর বল্‌লেন, আর বাহিরে কেন মা, আনন্দময়ীকে ঘরে তুলুন। আমি যে ফেরত গাড়ীতেই হরিদ্বার যাব।

রাণী দৌড়ে গিয়ে আত্মানন্দের হাত চেপে ধরে বল্‌ল, সে আর যেতে হয় না বৈদান্তিক! আপনাকে আমরা বেঁধে রাখব। এস তো বাবা শঙ্কর, ধর তো এই সন্ন্যাসীর আর একখানা হাত। দেখি উনি কেমন করে ছাড়িয়ে যান।

সুশীলা-দিদি আত্মানন্দের দিকে চেয়ে বল্‌লেন, দেখছ কি আনন্দ, বড় শক্ত পাল্লায় পড়েছ। তোমার ফেরত-গাড়ী যে কবে আসবে, তাই আমি ভাবছি।

আমি এতক্ষণ চুপ করেই ছিলাম; এইবার বল্‌লাম, আর বাইরে দাঁড়িয়ে কেন? শঙ্কর, কোল থেকে নেমে তোমার মাসীমাকে ঘরে নিয়ে যাও। ওঁরা যে পথশ্রমে ক্লান্ত হয়েছেন।

সুশীলাদিদি বল্‌লেন, ডাক্তারবাবু, এই বিদ্যা নিয়ে বুঝি রোগীর চিকিৎসা করেন, রোগ-নির্ণয় করেন। আমাদের ক্লান্তি

দেখলেন কোথায়? রাণী, ডাক্তারের ঐ চসমাটার পাওয়ার বাড়িয়ে দিও বোন। না, না, আর এখানে নয়; আমার রাজ্য-পাট আমি বুঝে নিই গে, কেমন কাকীমা!

আমার শাশুড়ী বল্‌লেন, এই দিনেরই তো প্রতীক্ষা করছিলাম, মা সুশীলা!

আমি বল্‌লাম, পেটে কিছু পড়েছে, না সুধুই আনন্দ।

আত্মানন্দ বল্‌লেন, পেটেও কিছু পড়ে নি, আনন্দেরও সীমা নেই। ক্ষুধাতৃষ্ণা ভুলে গিয়েছি ডাক্তারবাবু।

আমি বল্‌লাম, তা হ'লে ভালই হ'ল, গরীবের খরচ বেঁচে গেল।

তারপর আর কি। আমার বাড়ীতে সত্যসত্যই আনন্দের হাট ব'সে গেল। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে সুশীলাদিদি যেন কি এক আনন্দের, স্ফূর্ত্তির তরঙ্গ বহিয়ে দিলেন। এ মেয়েটা যাদু জানে না কি?

বাড়ীর মধ্যে আনন্দ-কোলাহল, বাহিরে স্বামী আত্মানন্দের সঙ্গে আমি সুশীলাদিদির সম্বন্ধেই আলোচনায় মগ্ন। সুশীলাদিদি যে কেন এতদিন পরে আশ্রম ত্যাগ করে এলেন, তারই বিবরণ স্বামীজির কাছে শুনলাম।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে মা এসে বললেন, বাবা হরেন, ওরা ত একেবারে আনন্দেই মাতোয়ারা হ'য়েছে। রাত হ'য়ে যাচ্ছে, স্বামীজির সেবার কি কোন নূতন ব্যবস্থা হবে, না উনি আমাদের রান্নাই সেবা করবেন।

আত্মানন্দ সহাস্যমুখে বল্‌লেন, মা, 'সেবা' কথাটা বল্‌বেন না,

ওতে অপরাধ হয়। আমি তো রাত্রে কিছু খাই নে, দিনের বেলায় একবার শাকান্ন, যা যোটে তাই খাই। আজ রাত্রে আর কিছুই খাব না, তবে স্নান করতে হ'বে।

মা বল্‌লেন, এই শীতের মধ্যে স্নান! না, না, স্নান ক'রে কাজ নেই, হাত-মুখ ধুয়ে ফেলুন। আপনি একাহারী তা জানি। কিন্তু, আজ তো দিনের বেলায় আহার হয় নাই, এখন আহার করুন, তাতে দোষ নেই।

আত্মানন্দ বল্‌লেন, মাতৃআজ্ঞা লঙ্ঘন করা মহাপাপ। যাক্ আমি স্নান করে নিই, তারপর একটু দুধ খাব। তা হ'লেই হ'বে। আর কিছু দরকার হ'বে না। মা সুশীলারও যে আজ দিনমান অনাহারে গেছে। তাঁর জন্য—

আত্মানন্দের কথা আর শেষ হ'তে পারল না, শঙ্করকে কোলে নিয়ে রাণীর হাত ধ'রে সুশীলা বৈঠকখানায় প্রবেশ করে বল্‌লেন, তাঁর জন্য কি আনন্দ!

আত্মানন্দ বল্‌লেন, তোমার তো সারাদিন অনাহারে গেছে, সেই কথা বল্‌ছিলাম।

সুশীলাদিদি বল্‌লেন, সারাদিন যে ভাবে গেছে, সারারাতও সেই ভাবেই যাবে। কাকীমা, আপনি ব্যস্ত হ'বেন না। আজ আমার উপবাস। ওতে আমার কষ্ট হয় না। যত দিন আশ্রমে ছিলাম, আমি কোন দিন অন্ন গ্রহণ করি নি, ফলমূলই খেয়েছি, মাসের মধ্যে দশদিন অনাহারেই কাটিয়েছি। আজও তাই। কাল সকালে এই ছদ্মবেশ ত্যাগ করব। এই গৈরিক বস্ত্র যে আজও

আমি ত্যাগ করিনি। কাল এই বেশ ত্যাগ ক'রে তারপরে অন্ন ব্যবস্থা। আজও আমার ভূমিশয্যা মা! আনন্দ, তুমি উপবাসী থেকো না। যাও, স্নান করে নাও, তারপর যা হয় কিছু খেও।

আমি বল্লাম, স্বামীজির আজ দুগ্ধ-পথ্য ব্যবস্থা হ'য়েছে। আর আপনার জন্ম কি ব্যবস্থা করতে হ'বে দিদি, তা আমাদের ডাক্তারী শাস্ত্রে লেখে না; সে ব্যবস্থা মা আর রাণী করবেন। অতএব, স্বামীজি, আপনি বাথরুমে যান, গরম জল আছে, দেরী করবেন না। আপনার দুগ্ধ-পথ্য দিয়ে তবে ডাক্তার অন্ন-পথ্য করবেন। মা, আজ আমি স্বামীজির সঙ্গে এই পাশের ঘরেই শোব। ওঁরা দুই বোনে শঙ্করকে নিয়ে থাকবেন। আজ কি আর ওঁদের ঘুম হ'বে।

এই ডাক্তার ঠিক কথা বলেছেন, এই ব'লে সুশীলাদিদি রাণীকে নিয়ে ভিতরে চলে গেলেন। মাও তাঁদের সঙ্গে গেলেন। আত্মানন্দ বাথরুমে গিয়ে স্নান করে এলেন। তারপর একটু দুগ্ধ পান করে বল্লেন, ডাক্তারবাবু, আপনি এইবার আহার ক'রে আসুন। আমি অপেক্ষা করছি; আপনার সঙ্গে অনেক আলোচনা করতে হ'বে।

আমার নিয়ম, যত রাত্রিতেই শুই না কেন, ভোর পাঁচটার সময় আমার ঘুম ভেঙ্গে যাবেই। আমি তখনই উঠে, হাতমুখ ধুয়ে, বাগানে গিয়ে মালীদের সঙ্গে কাজ করি। ইহাই আমার ব্যায়াম।

যে দিনের কথা বলেছি, তার পরের দিনও যথাসময়ে বাগানে কাজ করতে গিয়েছি, দেখি সুশীলাদিদি তার আগেই উঠেছেন।

আমাকে বাগানের মধ্যে দেখে তিনি সেখানে এলেন। আমি এত ভোরে তাঁকে দেখে বল্‌লাম, দিদি, রাতে বোধ হয় আপনার ঘুম হয় নি।

তিনি হেসে বললেন, ডাক্তারসাহেব সাধক রামপ্রসাদের একটা গান শোনেন নি। তিনি গেয়েছেন—

ঘুম ভেঙ্গেছে, আর কি ঘুমাই
যোগে যাগে জেগে আছি।
যাঁর ঘুম তাঁকে দিয়ে
ঘুমেরে ঘুম পাড়িয়েছি।

আমারও তাই হ'য়েছে। তা সে-কথা এখন থাকুক। আমি আপনাকে একটা কথা বলতে এসেছি। এর পরে তো সময় পাওয়া যাবে না। আপনি রোগী নিয়ে বসবেন, তারপর বেরিয়ে যাবেন। শুনলাম আপনি সেই একটা দু'টোয় ফেরেন। তারই জন্য এত সকালে আপনাকে বিরক্ত করতে এলাম। একটা কাজ করতে হ'বে ভাই। আপনি যখন বেরিয়ে যাবেন, তখন টেলিগ্রাফ আফিসে গিয়ে তিনকড়ি-মামাকে একটা খবর পাঠিয়ে দেবেন। তাকে জানাবেন যে, আমি এখানে এসেছি। তিনি যেন বড়-মাসীমাকে নিয়ে অবিলম্বে এখানে আসেন। তাঁরা দু'জন না এলে আমার কর্ত্তব্য স্থির হচ্ছে না। এখন আপনারা, আর তাঁরা দু'জনই আমার সহায় বলুন, সম্পদ বলুন, সব। তিনকড়ি-মামার নাম শ্রীতিনকড়ি মিত্র; ঠিকানা, ১৭ নম্বর রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট।

হরিদ্বারে স্বামীজিকেও একটা তার করতে হ'বে। আনন্দের যেতে তিন চারদিন বিলম্ব হ'বে, সেই কথাটা আশ্রমে জানাতে হ'বে। আরও একটা কথা বলব কি ডাক্তার সাহেব?

আমি বললাম, আপনি সঙ্কোচ বোধ করছেন কেন দিদি। আমরা যে আপনার আদেশ পালনের জন্ম সর্ব্বদাই প্রস্তুত।

দিদি একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন, দেখুন, আজ প্রায় দু' বৎসর হ'তে চলল বাবা নিরুদ্দেশ হয়েছেন। ব্যাপার যে কি হ'য়েছিল, তা আমি কাউকে বলি নি, বলা কষ্টকর, পিতার দুর্ব্বলতার কথা কন্যার মুখ দিয়ে বে'র হ'তে চায় না। সে কথা আর একদিন আপনাদের কাছে বলব। এখন এই দু' বৎসরের মধ্যে বাবার কোন সন্ধান নিই নি, নিতে ইচ্ছাও করে নাই, সুবিধাও হয় নাই। কাল থেকে মনে হচ্চে, যখন লোকালয়ে এলাম তখন বাবার কি হ'ল সে সংবাদ নেওয়া কর্ত্তব্য। তিনি বেঁচে আছেন, কি মারা গিয়েছেন, কিছুই জানি নে। যদি দেহ-ত্যাগ করে থাকেন, তা হ'লে তো সকল যন্ত্রণার, সকল প্রলোভনের হাত এড়িয়েছেন। আর যদি বেঁচে থাকেন, তা হ'লে কোথায় কি-ভাবে আছেন, তার একটু সন্ধান নিতে হয়। আপনি যদি নানা খবরের কাগজে একটু বিজ্ঞাপন দেন, তা হ'লে হয় তো তাঁর সন্ধান মিলতে পারে।

আমি বললাম বেশ, আজই সে ব্যবস্থাও করা যাবে। দু'টো তারও দশটার মধ্যেই পাঠিয়ে দেব।

তা হ'লেই হবে। আমি যাই, আর বিলম্ব করতে পারছিনে, আপনার ঘর-গৃহস্থালী আমাকে ডাকছে। এই বলে তিনি চলে গেলেন; আমি অবাক হয়ে সেই দেবী-প্রতিমার দিকে চেয়ে রইলাম।



সাত

পরদিন আমার হাতে পাঁচ-ছয়টী শক্ত রোগী ছিল; সেই জন্ত অন্তদিন অপেক্ষা একটু আগেই বে'র হ'তে হয়েছিল; ফিরতে দেরী হ'য়ে গিয়েছিল। আমি যখন বাড়ী ফিরলাম, তখন বেলা প্রায় দু'টো। মধ্যে মধ্যে এমন বিলম্ব আমার হ'য়েই পড়ে; বাড়ীর কেউ সেজন্ত ব্যস্ত হয় না। ডাক্তারেরা পরের স্বাস্থ্য-রক্ষার জন্ত খুব উপদেশ দিয়ে থাকেন; যথাসময়ে স্নান-আহার, বিশ্রাম করা যে শরীর ভাল রাখবার জন্ত বিশেষ দরকার, এ কথাও সর্ব্বদা বলেন; কিন্তু নিজেদের বেলায় সে বিধান লঙ্ঘন ক'রে থাকেন; তাঁদের স্নান-আহারের নির্দ্দিষ্ট সময় নেই। অর্থ-উপার্জ্জনের নেশায় যে ডাক্তারেরা এমন করেন, তাও অনেক ক্ষেত্রে ঠিক নয়; রোগীর চিকিৎসার ভার নিলে সর্ব্বপ্রযত্নে সে-কর্ত্তব্য পালন করতে হয়। এই কারণেই তাঁরা নিজেদের শরীরের দিকে চাইবার অবকাশ পান না। কে জানে বেলা চারটে, বা রাত্রি একটা, রোগীর বাড়ী থেকে ডাকতে এলেই ডাক্তারকে ছুটতে হয়—এ তাঁর কর্ত্তব্য কর্ম্ম। বিশেষতঃ, আমি রোগীর আহ্বানে স্থির থাকতে পারি নে। এখন যেতে পারব না, এমন কথা আমার মুখ দিয়ে বে'র হ'তে চায় না। তাই আমাকে বেলা একটা-দু'টোর কমে প্রায়ই বাড়ী ফেরা হয় না, অবশ্য সে জন্ত যে অর্থাগমও বেশী হয়, এবং মনেও আনন্দ হয়, এ কথাও গোপন করতে পারি নে।

যাক্ সে আলোচনা। আমি দু'টোর সময় বাড়ী এসে দেখি শ্রীমান্ তিনকড়ি বৈঠকখানায় একখানি ইজিচেয়ারে শুয়ে পা নাচাচ্ছেন। আমি তো অবাক্। কাল বেলা এগারটার সময় তাকে টেলিগ্রাম করেছিলাম। আমি ভেবেছিলাম, দুই-একদিন পরে তিনকড়ি তার দিদিকে সঙ্গে নিয়ে এখানে আস্‌বে; এখন দেখছি টেলিগ্রাম পাওয়া-মাত্রই তারা ছুটে এসেছে।

আমাকে দেখেই তিনকড়ি লাফিয়ে উঠে হাত-জোড় করে বল্‌ল, আদাব, ডাক্তারসাহেব! মেজাজ সরিফ!

আমি হেসে বললাম, ব্যাপার কি হে তিনকড়ি বাবু? তোমরা কি আমার টেলিগ্রামের জন্ম হাঁ ক'রে ব'সে ছিলে?

তিনকড়ি বল্‌ল, ডাক্তারসাহেব, কাগজ-কলম, লজঞ্চুস বেচে খাই; কোন দিন কোন কারণে কেউ কখন আমার মত সামান্ত দোকানদারকে চিঠি পর্য্যন্ত লেখে না, টেলিগ্রাম তো দূরের কথা। কাল যখন, এই বেলা দু'টো-আড়াইটার সময় পিয়ন এসে বলল, তিনকড়ি মিত্রের নামে তার আয়া হ্যায়, আমার তখন ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেল—আমার নামে তার! আমি যে কি করব, কি বলব, ভেবেই পাই নে,—একেবারে আড়ষ্ট হয়ে পড়েছিলাম! আমার সেই ভাব দেখে পিয়ন বল্‌ল বাবুজি, এই কাগজটায় সহি করে তার নিন, আমি দাঁড়াতে পারিনে। তখন আর কি করি কাঁপতে কাঁপতে রসিদ লিখে দিয়ে তারটা তো নিলাম। তারপর, খুলতে আর সাহসে কুলায় না, তারখানি হাতে করে চুপ করে বসে রইলাম।

এমন সময় বড়-দি এসে বল্‌লেন, কি রে তিনকড়ি, অমন ক'রে ব'সে আছিস যে? হাতে ওটা কি?

আমার তখন হুঁস হলো। আমি বল্‌লাম, একটা টেলিগ্রাম।

দিদি বল্‌লেন টেলিগ্রাম! কে তোকে টেলিগ্রাম কর্‌ল? তা' অমন ক'রে ব'সে আছিস কেন? খুলে দেখ্‌ কে তোকে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছে।

তাই তো! তখন খামটা ছিঁড়ে কাগজখানা বের করে পড়ে দেখে একেবারে আনন্দে লাফিয়ে উঠলাম।

দিদি বল্‌লেন, কি রে? কি খবর?

আমি বল্‌লাম, জয় বাবা বিশ্বনাথ! বড়-দি, ভারি সুখবর! কানপুর থেকে ডাক্তারবাবু তার করেছেন তোমাকে আর আমাকে অবিলম্বে সেখানে যাবার জন্য. মা সুশীলা কানপুরে এসেছে। সেই আমাদের. ডেকে পাঠিয়েছে। আর বিলম্ব নয় বড়-দি! এখনই যেতে হবে। আমি একবার দোকানে গিয়ে সব ঠিক করে আসি, জেনে আসি গাড়ী কখন ছাড়বে। তুমি যা হয় দু'চার খানা কাপড়, গরম গায়ের কাপড়, খান দুই কম্বল ঠিক করে নাও। সুমুখে যে গাড়ী পাওয়া যাবে, তাতেই যাওয়া।

তারপরে আর কি! রাত্রের পঞ্জাব-মেল ধরে এই খানিকটা আগে আপনাদের তিনকড়ি দিদিকে নিয়ে উপস্থিত। দেরী করবার কি উপায় ছিল ডাক্তারসাহেব? মা সুশীলার আদেশ! জানেন তো, সেই সে-বার একদিন বিলম্ব ক'রে সাজাহানপুরে

গিয়ে আর মাকে সেখানে দেখতে পাই নি। তাই তো এবার ছুটে এসেছি ডাক্তারসাহেব। কেমন, ভাল করি নি। ও-মেয়েটার কি বুদ্ধির স্থির আছে? হয় তো কালই কোথায় চ'লে যেতো। যাক—ঠিক এসে গেছি! দেখেছেন, নিজের কথাই পাঁচ কাহন! আপনি যান, স্নান-আহার ক'রে স্থির হোন; তারপর গল্প করা যাবে, তিনকড়ি শর্ম্মা আজই ফিরে যাচ্ছেন না, বুঝলেন?

আমি বললাম, যেতে চাইলেই অমনি যাওয়া। এবার বেঁধে রাখবার অস্ত্র এনে ঘরে রেখেছি। এই ব'লে আমি ভিতরে যাবার জন্য পা বাড়িয়েছি, অমনি তিনকড়ি ব'লে উঠল, বাঃ বাঃ, আচ্ছা লোকের বাড়ীতে এসেছি তো! একবার বললেনও না যে, ও হে তিনকড়ি, খাওয়া-দাওয়া হয়েছে তো?

আমি বললাম, বাড়ী কি আমার তিনকড়ি? এ যে তোমাদেরই বাড়ী! এতদিন পরে কি সে-কথাটাও জানিয়ে দিতে হ'বে?

তিনকড়ি হাত-যোড় করে বলল, অপরাধ হ'য়েছে ডাক্তার-সাহেব! মূর্খ মানুষ, অত জ্ঞান-বুদ্ধি থাকলে তো কানপুরের ডাক্তারসাহেবই হ'তে পারতাম, কলকাতার চিৎপুর রোডে লজেঞ্চুস্ বিক্রী করতাম না।

আমি বল্‌লাম, এই বেলা তিন প্রহর পর্য্যন্ত লোকের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে বেড়ানোর চাইতে চিৎপুর রোডের দোকানে ব'সে লজেঞ্চুস্ বিক্রী করা ঢের ভাল তিনকড়ি! যাক, আমি এখন

কাপড়-চোপড় ছেড়ে দু'টো খেয়ে নিই। তুমিও একটু নিদ্রা দাও, গাড়ীতে নিশ্চয়ই ঘুমুতে পার নি।

তিনকড়ি বলল, ঘুম! বসবার জায়গা যে পেয়েছিলাম এই ভাগ্যি! দিদি তো সারা পথ গাড়ীর মেজেতে ঠায় বসে কাটিয়েছে। গরীব দোকানদার মানুষ, বেশী ভাড়ার গাড়ীতে তো চড়বার সামর্থ্য নেই; আমাদের, সেই সনাতন এক-শো এগার নম্বর। যান, যান, এখন আর কথা কইবেন না; খেয়ে আসুন, আমার দিনে ঘুম হয় না। আমি রাজা রাজবল্লভের মত এই সিংহাসনে ব'সেই পা নাচাব।

আমি তখন ভিতরে যেতেই তিনকড়ির বড়-দিদি এসে বললেন, বাবা, তোমার এত দেরী হোলো! রোজই কি এমন হয়?

আমি বললাম, দশ দুয়োরে ঘুরতে হয়, তাই দেরী হ'য়ে যায়। এমন প্রায়ই হয়।

তিনি বললেন, আহা, তোমার যে ভারি কষ্ট হয় বাবা! আর এরাও তোমার অপেক্ষায় না খেয়ে ব'সে থাকে।

আমি বললাম, মাসী-মা, আমি ব'লে ব'লে হায়রাণ হয়েছি যে, আমার জন্য যেন কেউ অপেক্ষা না করেন। কিন্তু মা-ও সে কথা শুনবেন না, রাণীও শুনবে না। এখন, আপনি এসেছেন, ওঁদের ঐ প্রথাটা যদি ভেঙ্গে দিতে পারেন।

আমি উপরে গিয়ে কাপড় ছেড়ে একখানি সোফায় শুয়ে বিশ্রাম করছি, এমন সময় রাণী এসে বলল, বাঃ, তুমি তো

আচ্ছা মানুষ, হাত-পা ছড়িয়ে বিশ্রাম করছ. আর তোমার অপেক্ষায় তিনকড়ি মামা না খেয়ে বসে আছে।

আঁা, কি বল্‌ছ ? তিনকড়ির কি খাওয়া হয় নাই ?

রাণী বলল, আমরা কত বললাম, কিছুতেই মামা খেতে রাজী হোল না, বল্‌ল, গৃহস্বামী আসুন, তবে একসঙ্গে খাব। এ দিকে গৃহস্বামী নিশ্চিন্ত মনে আরাম করছেন।

আমি তখন তাড়াতাড়ি সিঁড়ির কাছে গিয়ে ডাক্‌লাম, ওগো তিনকড়িবাবু, এ দিকে একবার আসতে হ'বে।

তিনকড়ি নীচে থেকেই জবাব দিল, জী হুজুর, যাতা হুঁ।

ওরে বাবা! একেবারে খাস হিন্দী বাত্! তিনকড়ি উপরে এসে বল্‌ল, সেলাম পৌছে মহারাজ! বন্দা হাজির।

আমি বললাম, এ কি ব্যাপার! আমার অপেক্ষায় তুমি না খেয়ে ব'সে আছ! তা, সে কথা বল্‌তে হয়। আমি মনে করেছিলাম, তুমি খাওয়া-দাওয়া সেরে নীচে বিশ্রাম করছ!

তিনকড়ি বল্‌ল, আপনি মনে করতে পারেন ডাক্তার-সাহেব। কিন্তু এই তিনকড়ি মিত্তির না হয় লেখা-পড়াই না জানে; কিন্তু কায়েতের ছেলে তো, আর সেও যেমন-তেমন কায়েত নয়—একেবারে কুলীন—এখনও ফোঁস করে। তার তো আদব-কায়দা জ্ঞান আছে। গৃহ-স্বামীকে ছেড়ে সে খাবে কেমন করে ?

আমি বল্‌লাম, তোমার যে এমন আদব-কায়দা-জ্ঞান, তা জানতাম না তিনকড়ি। কিন্তু, তুমি আমার উপর. অবিচার

করেছ; একটু আগেই বলি নি, এ বাড়ী আমার নয়—তোমাদের। তুমি বুঝি তা ভাব না—মামা-শ্বশুর হও কি না সম্পর্কে। কেমন?

তিনকড়ি বল্‌ল, “না বাপু, আমি ও-সব শ্বশুরটস্থুর হতে পারব না—আমি তোমাদের দাসানুদাস তিনকড়ি মিত্র। সুশীলা আর রাণী ভালবেসে মামা বলে ডাকে। হাঁ, আজ যদি সতীশবাবু বেঁচে থাকৃত, তা হ'লে বড় গলা ক'রে বলতাম, আমি সতীশ চাটুর্য্যের শালা। সে যে আমার কত বড় গৌরবের সম্বন্ধ ছিল হরেনবাবু, তা কাকে বল্‌ব। সব গিয়েছে। সতীশবাবু নেই, ছোটমাসী নেই, আছেন, বড়-দিদি আর আমার ছোট-দিদি রাণীর মা, আর রাণী, আর ঐ ভবশঙ্কর। সুশীলা থেকেও ছিল না ডাক্তারবাবু, আপনার কৃপায় আজ তাকে মনে হচ্চে ফিরে বুঝি পেলাম। কিন্তু——

তিনকড়ির কথা শেষ না হ'তেই সুশীলা-দিদি ঘরের মধ্যে এসে বল্‌লেন, আর কিন্তু নয়, বেলা তিনটে বাজে যে! নীচে ভাত দেওয়া হয়েছে। জামাইবাবু গা তোলো ভাই, তিনকড়ি মামা যে না খেয়ে বসে আছে।

কাজেই বাগাড়ম্বর তখনকার মত মুলতুবী রেখে আহার অন্বেষণে নীচে যেতে হোলো।



আট

পাঁচটার সময় শহর থেকে তিন মাইল দূরে এক গ্রামে একটী রোগী দেখ্‌তে যাওয়ার কথা। সুতরাং ঘণ্টা দেড়েক বিশ্রামের পরই আবার সাজ-গোছ করতে হোলো।

নীচে নেমে দেখি, বৈঠকখানার পাশের ঘরে স্বামী আত্মানন্দ আর তিনকড়ি মৃহা গল্প জুড়ে দিয়েছে। আমি সেই ঘরের মধ্যে গিয়ে বল্‌লাম, যাবে তিনকড়ি, আমার সঙ্গে একটু বেড়াতে। আপনিও আসুন না স্বামীজি।

তিনকড়ি বল্‌ল, কিছু মাত্র আপত্তি নেই। কিন্তু, আপনি যে এমন ধড়াচুড়া পরে বেড়াতে বেরুচ্ছেন, এতে আমার সন্দেহ হচ্চে, এ তো বেড়াবার বেশ নয় ডাক্তারসাহেব।

আমি হেসে বল্‌লাম, বেড়ানোও হ'বে, আমার একটা জরুরী রোগী দেখ্‌তেও হ'বে। এই এখান থেকে মাইল তিনেক দূরে একটা গ্রামে যেতে হ'বে। আপনারা গাড়ীতেই ব'সে থাক্‌বেন; আমি এই আধ ঘণ্টার মধ্যেই রোগী দেখে ব্যবস্থা করে ফিরে আসব। তারপর খুব একটা চক্র দিয়ে বাড়ী ফেরা যাবে। কি বলেন?

স্বামীজি বল্‌লেন, সে কথা ভাল। আমাদের বেড়ান হ'বে, আপনার পকেটেও কিছু রৌপ্য মুদ্রার আবির্ভাব হ'বে। মন্দ কি! এই ব'লে তিনি শয্যাত্যাগ করলেন; তিনকড়িও

উঠে বল্‌ল, বাবা, এখানে যে শীত। একটা কম্বল টম্বল গায়ে জড়িয়ে নিই।

সেই সময় সুশীলা-দিদি সেই ঘরের মধ্যে এসে বল্‌লেন, কোথায় গমন হচ্চে সবার।

আমি বল্‌লাম, বিশেষ কোথাও নয়। আমি একটা রোগী দেখতে যাচ্ছি, ওঁরাও আমার সঙ্গে বেড়াতে যাচ্ছেন।

সুশীলা-দিদি ঠাট্টা ক'রে বল্‌লেন, রোগীর অবস্থা বোধ হয় সঙ্গীন, তাই টেনে বার করবার জন্য সঙ্গীর দরকার! দেখ আনন্দ, তুমি কিন্তু রোগীর মাথার দিক ধোরো।

আমি বল্‌লাম, দিদি, আপনি তো আমার রোগীর পরম শুভানুধ্যায়িনী দেখ্‌ছি। না, না, তেমন সঙ্গীন অবস্থা নয়। আর রোগী নয় রোগিনী। বড়-মানুষের স্ত্রী। সামান্য একটু জ্বর হ'য়েছে, হয় তো ঠাণ্ডা লেগেছে। তাই ডাক পড়েছে ডাক্তার-বাবুর। বড়-মানুষের ব্যাপার। হয় তো দুই এক দাগ মিক্‌স্‌চার দিলেই আরাম হ'য়ে যাবে। আমার ষোলটী টাকা পাওনা আছে, না দিয়ে যাবে কোথায়?

দিদি বল্‌লেন, অতি উত্তম সংবাদ! কিন্তু, কথা হচ্চে এই যে, তাড়াতাড়ি তার করে বড় মাসীমা আর তিনকড়ি মামাকে আনা হোলো। ওঁদের তো আর অকারণ বসিয়ে রাখা যাবে না, কাজকর্ম্ম ছেড়ে ওঁরা তো বেশী দিন থাকতে পারবেন না। তাই বলছি, তোমরা একটু সকাল সকাল ফিরে এসো। আজ সন্ধ্যার পরই আমাদের একটা পরামর্শ-সভা বসাতে হ'বে।

আমি বল্লাম, আজকের দিনটা ক্ষমা করতে হ'বে দিদি! ওঁরা কাল সারারাত গাড়ীতে ব'সে কাটিয়েছেন, আজ যদি আবার রাত বারোটা পর্য্যন্ত মজলিস বসে, তা হ'লে ওঁদের প্রতি বিশেষ অত্যাচার করা হ'বে। অতএব আমি প্রস্তাব করছি, আজ আর আমাদের মজলিস বস্‌বে না, আজ বিশ্রাম। কাল সন্ধ্যার পর আমাদের পার্লিয়ামেণ্টের অধিবেশন হ'বে। ওহে তিনকড়ি, তুমি প্রস্তাব সমর্থন কর।

তিনকড়ি বল্‌ল, সুশীলা দেখছি মহা ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছে। তা ভয় কি? আমরা কালই পালাচ্ছি নে। দুই-তিন দিন আছি, চাই কি পাঁচ-সাত দিনও থাক্‌তে পারি। সুতরাং আজই কর্ত্তব্য-নির্ণয়ের জন্য তাড়াতাড়ি কি? আর কর্ত্তব্যই বা এমন কি? ষ্টেশনে যাওয়া, কলকাতার কয়েকখানা টিকিট কেনা, তারপর রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীটে আমার গরীব-খানায় উপস্থিত হওয়া, প্রত্যহ প্রাতঃকালে গঙ্গাস্নান করা, তারপর আহারাদি শেষ করে বিশ্রাম, গল্প, ঠাকুর-দেখা, রামায়ণ-মহাভারত পড়া। ব্যস্, এই তো কর্ত্তব্য! এর জন্য আবার পরামর্শ কি। তবে একটা বিশেষ কথা আছে। না, এখন সে কথা থাক্। রাত্রে ফিরে এসে বল্‌ব, না হয় কালই বল্‌ব। এ কদিনই যখন বলি নি, তখন একটা দিন আর কি?

দিদি বল্লেন, এমন কি কথা তিনকড়ি মামা, যা এত দিন গোপন করেছ।

তিনকড়ি হাঃ হাঃ করে হেসে বল্‌ল, শুনেছেন ডাক্তার-সাহেব!

শুন্‌লেন৽ স্বামীজি মহারাজ, যতই শাস্ত্র পড়ান, আর যতই গেরুয়া পরান, ফলমুল ভোজন করান, মেয়ে-জাতের ঐ যে গোপন কথা জান্‌বার জন্য একটা আগ্রহ তা কিছুতেই যাবার নয়। দেখলেন ত, কি এমন কথা, তাই জান্‌বার জন্য ওর কেমন ব্যগ্রতা! তা, যতই ব্যস্ত হও না, আজ এখনই আমি সে গোপন কথা ভাঙ্গছিনে। তুমি যতই ভাব না কেন, সে কথার উদ্দেশই পাবে না। সে-কথা এক আমি জানি, আর জান্‌তেন সতীশবাবু! যাক্ গে, চলুন হরেন্দ্রবাবু, আপনার রোগিনীর চিকিৎসা ক'রেই আসা যাক্।

দিদি বললেন, আমার এই তিনকড়িমামার পাগলামি কোন দিন যাবে না। হরিদ্বারে আচার্য্যদেব ওকে ওরই জন্য ভারি ভালবাস্‌তেন।

তিনকড়ি বলল, আর বল্‌লে না যে, তোমার আচার্য্যদেব বলেছেন, আমি মুক্ত পুরুষ! যেমন-তেমন লোকের সার্টিফিকেট নয়—স্বয়ং আচার্য্যদেব। দেখো, এবার কল্‌কাতায় গিয়ে দোকানের সুমুখে ঐ কথা লিখে একটা সাইন-বোর্ড টাঙ্গিয়ে দেব। তখন আমার দোকানের সিগারেট রোজ পাঁচ-সাত বাক্স বিক্রী হ'বে। মহাপুরুষের সার্টিফিকেট—যে সে কথা নয়।

দিদি বল্‌লেন, তবে আর কি! তিনকড়িমামা তো আমার কর্ত্তব্য স্থির করেই ফেলেছে। আর পরামর্শ-সভার কোনই দরকার নেই। কল্‌কাতায় চল, রাজা রাজবল্লভের প্রাসাদে অধিষ্ঠিত হও। তিনকড়িমামার দোকানের আয়ে জীবনযাত্রা

নির্ব্বাহ. কর; তারপর যথাসময়ে কাশীমিত্রের ঘাটে যাও! একেবারে নিরাপদ পন্থা! কি বল আনন্দ!

কাউকেই কিছু বল্‌তে হোলো না—ডাক-পিয়ন এসে সমস্ত বলা-কওয়ার মোড় একেবারে ফিরিয়ে দিল। একখানি চিঠি!

চিঠি আমার নামে, মোড়কের উপরের হস্তাক্ষর আমার পরিচিত। চিঠি লিখেছেন বৃদ্ধ ডাক্তার গ্রেহাম;—সেই ডাক্তার সাহেব যিনি আমার শ্বশুরের জীবিত অবস্থায় মৃত-প্রায় দিদি সুশীলার চিকিৎসা করে মরণের দুয়ার থেকে টেনে এনেছিলেন।

ডাক্তার গ্রেহাম বিলাত থেকে সর্ব্বদাই আমাকে চিঠি লিখতেন। আমার শ্বশুরের পরলোক গমনের পর তিনি আমার কাছ থেকেই সকলের সংবাদ নিতেন। প্রতি পত্রেই সুশীলাদিদি আর তিনকড়ির সংবাদ জিজ্ঞাসা করতেন। তাঁর স্ত্রী-বিয়োগের সংবাদ ও ভারত-গবর্ণমেণ্টের চাকুরী হইতে অবসর-গ্রহণের সংবাদও যথাসময়ে আমাকে দিয়েছিলেন।

কিন্তু তিনি যে পুনরায় ভারতবর্ষে আসবেন, এ কথা কোন দিনও আমাকে জানান নাই। অকস্মাৎ পুণা থেকে তিনি এই পত্র লিখেছেন। তিনি যা ইংরাজীতে লিখেছেন, তার সার মর্ম্ম এই—

প্রিয় ডাক্তার হরেন্দ্রনাথ,—

আমি তোমাকে পুণা থেকে পত্র লিখ্‌ছি, এ দেখে তুমি আশ্চর্য্য বোধ করবে। আমি যে এ দেশে আসব, এর সম্ভাবনার কথাও কোন দিন তোমাকে জানাই নাই। হঠাৎ আমি এ দেশে আসা স্থির করেছিলাম!

গেল মেলে আমি বোম্বাই নেমেই পূণায় এসেছি। আমার মামার ছেলে এখানকার সিবিলিয়ান ম্যাজিষ্ট্রেট্। তাঁরই বাড়ীতে আমি আতিথ্য স্বীকার করেছি।

বিলাতে আমার আর কোন বন্ধনই নেই। চিররোগিনী স্ত্রীকে নিয়ে লণ্ডনের নিকটবর্ত্তী এক পল্লীতে কিছু দিন কাটিয়েছি, তারপর তিনি মারা গেলেন; আমার আর আপনার বল্‌তে কেউ রইল না। মাস কয়েক কেটে গেলে মনে হোলো, আমার যৌবন ও প্রৌঢ়ের কর্ম্মভূমিটা একবার জন্মের শোধ দেখে আসি। তাই আমি এখানে এসেছি। হয় তো আবার ফিরেও যেতে পারি, অথবা জীবনের অবশিষ্ট কয়টা দিন এখানেও কাটাতে পারি। সে-কথা এখনও ঠিক করি নাই।

কয়েক মাস পূর্ব্বে তোমার যে পত্র পেয়েছিলাম, তাতে তুমি লিখেছিলে, সুশীলা তখনও হরিদ্বারে এক স্বামীজির আশ্রমে আছেন, তিনকড়ি কলকাতায় আছেন। আমি তাদের দুই জনকেই একবার দেখতে চাই। বল্‌তে কি, আমার এ-দেশে আস্‌বার অন্যতম আকর্ষণই তারা। তুমি এই পত্র পাওয়ামাত্র আমাকে লিখবে, সুশীলা এখনও হরিদ্বারে আছে কি না। আর তিনকড়ির কল্‌কাতার ঠিকানাটাও আমাকে জানিও। তোমার পত্র পেলে তবে আমি আমার ভ্রমণের প্রোগ্রাম ঠিক করব এবং তোমাকে জানাব। যাওয়ার সময় কানপুর থেকে তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাব। পূর্ব্বে সংবাদ দেব, তুমি দুই-এক দিনের অবকাশ করে নিও। আমার সম্পূর্ণ ভ্রমণের প্রোগ্রামই তোমাকে পাঠাব।

অতএব অতি সত্বর পুণার ঠিকানায় আমাকে পত্র লিখো এবং যে যে সংবাদ জানতে চেয়েছি, তাহা লিখো। ভরসা করি তোমরা কুশলে আছ।

তোমাদের শুভার্থী

এ, গ্রেহাম্

আমি যখন পত্রখানি পড়ছিলাম, তখন সকলেই উদ্‌গ্রীব হ'য়ে আমার দিকে চেয়েছিল। আমি পত্রপাঠ শেষ করে বল্‌লাম, এই দেখ আর এক ব্যাপার। দিদি, আপনার কর্ত্তব্য আর আমাদের স্থির করতে হ'বে না। পৃথিবীতে আপনার সর্ব্বাপেক্ষা যিনি হিতৈষী, তিনি আস্‌ছেন। মনে আছে দিদি, সাজাহানপুরের সেই বুড়ো ডাক্তার গ্রেহামকে। তিনি আপনাকে ও তিনকড়িকে দেখবার জন্য বিলাত থেকে এই বৃদ্ধ বয়সে ছুটে এসেছেন। তিনি সে-দিন বোম্বাই পৌঁচে পুণাতে তাঁর মামাতো ভাইয়ের ওখানে উঠেছেন। আপনারা দুই জন এখন কোথায় আছেন, তাই জানবার জন্য আমাকে চিঠি লিখেছেন। আমার কাছ থেকে সংবাদ পেলেই তিনি দিন স্থির করে আমাকে লিখবেন এবং এখানে এসে আমাকে সঙ্গে নিয়ে হরিদ্বারে যাবেন। তারপর তিনকড়িকে দেখবার জন্য কল্‌কাতায় যাবেন। তারপর যে কি কি করবেন, তা এখনও ঠিক করেন নি।

এই কথা শুনে তিনকড়ি একেবারে লাফিয়ে উঠে বলল, দেখলে মা সুশীলা, কেমন যোগাযোগ। ও গো বড়-দি শীগ্‌গির এসো। রাণী, সুসংবাদ শুনে যাও।

ত্রিনকড়ির চীৎকার শুনে সবাই দৌড়ে এলেন। আমি তখন ডাক্তার গ্রেহামের পত্রের কথা সকলকে বললাম। রাণী বলল, আর দেরী কোরো না, এখনই যাও। ডাক্তার সাহেবকে তার করে দেও যে, তাঁকে কোথাও যেতে হ'বে না; তাঁর আশীর্ব্বাদে সবাই এখানে মিলেছেন। তিনি যেন পরের ট্রেণে রওনা হন। আরও বোলো যে, তিনি এখানে এসে আমাদের গরীবখানাতেই অতিথি হ'বেন। যাও, আর দেরী কোরো না গো। তার ক'রে দিয়ে তারপর তুমি তোমার রোগী দেখতে যেও, বুঝলে।

সুশীলা-দিদি এতক্ষণ একটা কথাও বলেন নাই, চুপ করে সব সংবাদ শুনছিলেন। রাণীর আদেশ-প্রদান শেষ হ'লে বললেন, আনন্দ, কিছু বুঝলে কি? এমন সংযোগ হবার জন্যই আমি আশ্রম ছেড়ে এখানে এসেছি। আর আমার ভয় নেই আনন্দ। স্বয়ং আনন্দময়ী ক্রমে সব ঠিক করছেন। আনন্দ, তোমাকে যে আরও কয়েকদিন এখানে থাকতে হচ্চে! সে মহাত্মাকে না দেখে, তাঁর কথা না শুনে তো তুমি আশ্রমে ফিরে যেতে পার না।

রাণী বলল, সে কথা আর বলছ কেন দিদি। স্বামীজিকে থাকতেই হ'বে। দিদি, এরই নাম প্রাণের টান। কোথাকার বিদেশী সাহেব, কবে তোমার চিকিৎসা করেছিলেন। আর দেখ দেখি, তিনি সে কথা ভুলতে পারেন নি। ওঁকে যখনই চিঠি লিখেছেন, তখনই তোমাদের মঙ্গল সংবাদ জিজ্ঞাসা করেছেন। আর কি না, এই শোকজীর্ণ বৃদ্ধ সাত সমুদ্র তের নদী পার হ'য়ে তোমাদের দেখবার জন্ত এদেশে এসেছেন। একে কি বলবে দিদি।

দিদি বললেন, এ সব তাঁরই কৃপা—তাঁরই কৃপা। তিনি যে দয়াময়, আনন্দময় বোন !

রাত ন'টার সময়ই আমার টেলিগ্রামের উত্তর এলো। ডাক্তার গ্রেহাম তার করেছেন—Your guest reaches Cawnpur Monday morning seven.

তোমার অতিথি সোমবার প্রাতঃকালে সাতটায় কানপুরে পৌঁছিবে।

তার পেয়ে আমরা সবাই খুব আনন্দিত হ'লাম। সেদিন শুক্রবার। মধ্যে দুই দিন। এই দুই দিনের মধ্যে ডাক্তার সাহেবের অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করতে হ'বে। যে কয়দিন তিনি দয়া করে আমার বাড়ীতে থাক্‌বেন, তাঁর কোন প্রকার অসুবিধা না হয়, সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হ'বে।

রাণী বলল, আমাদের বাগানের মধ্যে যে ছোট একতলা বাড়ীটা আছে, সেইখানেই সাহেবের থাক্‌বার ব্যবস্থা করতে হ'বে। সুমুখে ছোট একটা বারান্দা আছে, একটা ড্রয়িং রুম আছে; দু'পাশে দু'টো শোবার ঘর আছে, বাথ-রুম আছে। বেশ নিরিবিলিতে বুড়ো মানুষ থাকবেন। ওখানে যা সামান্য আসবাব-পত্তর আছে, তাতে হ'বে না। এ বাড়ী থেকে কিছু নিয়ে যেতে হ'বে, দু'-চারটে জিনিষ কিনতেও হ'বে। বাড়ীটা বেশ করে সাজিয়ে ফেলতে হ'বে। আর এক কাজ করতে হ'বে। সাহেবদের যে হোটেল আছে, সেখান থেকে সাহেবের খানা আনবার ব্যবস্থা করতে হ'বে। হোটেলের দুই জন

খানসামাকে, সাহেব যে কয়দিন থাকবেন, সেই কয়দিন দিন-রাত হাজির থাকবার ব্যবস্থা করতে হ'বে।

তিনকড়ি বলল, সব ভার হোটেলের উপর দিলে চলবে না, তোমাদের দ্রৌপদীকেও সে কয়দিন ষোড়শোপচারে বাঙ্গালী খানার আয়োজন করতে হ'বে। সাহেব না খান, আমরা তো আছি; তোমার জিনিষ নষ্ট হ'বে না রাণী, এ কথা আমি ব'লে দিচ্ছি।

বড় মাসীমা হেসে বললেন, তোর পাগলামি আর কোন দিন গেল না তিনকড়ি!

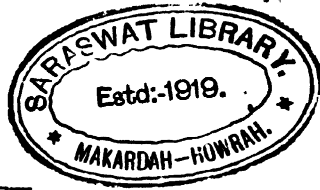
তিনকড়ি বলল, পাগলামি কি হোলো। আচ্ছা বৌদি, আপনিই বলুন তো, আমি ঠিক কথা বলিনি। সাহেব যদি কোন দিন খাবার সময় দিশী খানা খেতে চান, তখন কি করবে—রহড়কা দাল আর মোটা রুটি দিতে পারবে? তারই জন্য বলছি।

সুশীলা-দিদি বললেন, তার জন্য ভাবতে হ'বে না তিনকড়িমামা।

তিনকড়ি বলল আর এক কথা বলি। ঐ যে তখন একটা কথা বলি বলি করেও চেপে গেলাম, তা আর আমাকে বলতে হ'বে না। যাঁর কথা তিনিই যখন আসছেন তখন তাঁর মুখ থেকেই শুনতে পাবে। এখন এখানেই সভা ভঙ্গ; সকাল-সকাল শয়ন ক'রতে হ'বে, কাল যে সারারাত ব'সে কেটেছে।

আমার শাশুড়ী বললেন, আমিও সেই কথাই বলতে যাচ্ছিলাম। রাণী! ঠাকুরকে বল, সকলের খাবার দিক। আর দেরী ক'রে কাজ নেই।

তিনকড়ি বলল, তথাস্তু।



নয়

সোমবার। সেই পৌষ মাসের ভয়ানক শীতের রাত্রি প্রভাত না হ'তেই রাণী উঠে প্রথমে বাড়ীর সকলকে জাগিয়েছে। তারপর আমার কাছে এসে চেঁচাচ্ছে, ও গো ওঠো, কখন চারটে বেজে গিয়েছে। আজ আর পাঁচটার সময় উঠ্‌লে চলছে না।

আমি নিদ্রাজড়িত অবস্থাতেই বললাম, এখনই তাড়াতাড়ি কি? গাড়ী আসবে সেই সাতটা বাইশ মিনিটে, ঢের সময় আছে।

রাণী বলল, শোন কথা। এখন উঠে সব ঠিক আছে কি না দেখে-শুনে তবে তো ষ্টেশনে যেতে হবে। আমি সবাইকে ডেকে তুলেছি। তোমার গাড়ী তো ঠিকই আছে। আর যে দু'খানা গাড়ীর কথা বলা আছে, লছমনকে তাদের ওঁখানে পাঠিয়ে দিয়েছি। তাদের পাঠিয়ে দিয়ে সে ঐ পথে হোটেলে যাবে। সেখান থেকে খানসামাদের ডেকে দিয়ে ষ্টেশনে চলে যাবে। তোমাকে কিছু করতে হবে না। তুমি ত রোজ পাঁচটায়ই ওঠো; আজ না হয় ঘণ্টা খানেক আগেই উঠলে। ও কি, আবার যে লেপ টান্‌ছ। না, না, লক্ষ্মীটি, এখন ওঠো। আমার সারারাত ঘুম হয় নি। এই বুঝি সকাল হ'য়ে গেল, এই ভয়ে আমি জেগেই আছি। ওঠো, হাত-মুখ ধুয়ে একবার বাগানের ঘরটা ঠিক করে সবাই মিলে একটু আগে থাকতেই ষ্টেশনে যাই। কি জানি,

গাড়ী যদি একটু আগেই আসে, তা হ'লে কি হবে? ডাক্তার সাহেব ষ্টেশনে নেমে কাউকে না দেখলে কি মনে করবেন?

সেই সময় সুশীলা-দিদি এসে বললেন, আচ্ছা মেয়ের পাল্লায় পড়া গিয়েছে। নেও, এখন চল ষ্টেশনে যাই। তোমার তাড়ায় সবাই প্রস্তুত হয়েছে, এখন গেলেই হয়।

কি করি, সেই শীতের মধ্যেই উঠতে হোলো। তারপর বাগানের সেই ঘরে গিয়ে দেখি খানসামা দুইজনই এসেছে। তারা ষ্টোভ জ্বেলে জল গরম করতে আরম্ভ করেছে—রাণীর যে তাড়া!

ছ'টা বাজবার আগেই গাড়ী এসে পড়ল। আর দেরী সইল না; তখনই ষ্টেশনের দিকে যাত্রা করা গেল। বাড়ীতে ধাইয়ের জিম্মায় ভবশঙ্করকে রেখে বাড়ীশুদ্ধ সবাই ষ্টেশনে গেলাম। ট্রেণ আসবার তখনও তিন কোয়ার্টার বিলম্ব। সবাই ওয়েটিং-রুমে আশ্রয় নেওয়া গেল।

যথাসময়ে ট্রেণ এলো। ফার্ষ্ট ক্লাসের একটা কামরা থেকে ডাক্তারসাহেব নামলেন। আমাদের সকলকে ষ্টেশনে দেখে তিনি একেবারে অবাক্ হ'য়ে গেলেন। আমরা তাঁকে অভ্যর্থনা করলে তিনি হাসি-মুখে বললেন, হরেন্দ্র, তোমাদের এখানে কি এখন জুন মাস? এই শীতে সবাই এসেছ আমার অভ্যর্থনা করতে। এ জানলে আমি আগে থাকতে সংবাদই দিতাম না।

সুশীলা-দিদি বললেন, আপনি খবর না দিলেও আমরা জানতে পারতাম—যোগবলে!

ডাক্তারসাহেব বললেন, তা তুমি জানতে পারতে সুশীলা।

এ কথা আমি বিশ্বাস করি। ওয়েল তিনকড়ি, তোমার চেহারা তো একটুও বদল হয় নি; যেমন দেখেছিলাম, তেমনই আছ। বেশ, বেশ। এখন চল, তোমাদের দৌলতখানায় যাওয়া যাক্। তোমাদের তো ভারি কষ্ট দিলাম।

তিনকড়ি বলল, আপনি কষ্ট দেন নাই সাহেব, যা কষ্ট দিয়েছে এই রাণী। সেই রাত তিনটেয় সবাইকে জাগিয়েছে ঐ মেয়েটা।

ডাক্তারসাহেব রাণীর মাথায় হাত দিয়ে বললেন, এ যে আমার সতীশের মেয়ে। এত আপনার জন থাকতে আমি এত দিন মনে করেছি, সংসারে আমার কেউ নেই। হরেন্দ্র, আমার সে ভ্রম দূর হোলো। এই বুড়োর জন্য বিধাতা এখানে এত স্নেহ জমা করে রেখেছেন, তা তো আমি জানতাম না। চল, আর শীতে কষ্ট পেয়ে কাজ নেই।

আমাদের বাড়ীতে এসে সমস্ত ব্যবস্থা-বন্দোবস্ত দেখে সাহেব খুব আনন্দিত হ'লেন; বল্লেন হরেন্দ্র, তোমরা আমার জন্য যে আয়োজন করেছ, আমি কিন্তু এ-সব আশা করি নি; আর এ রকম আড়ম্বর আমি ইচ্ছেও করি নি। তোমার বাড়ীতে এসে ঠিক তোমাদের মত থাকব, এই আমি আশা করেছিলাম। তোমরা আমাকে সাহেব মনে ক'রে এ সব করেছ, তা আমি বুঝতে পারছি। আরে পাগল, আমি যদি সাহেবের মতই আসতাম, তা হ'লে সাহেবদের হোটেল ছিল, ডাক-বাংলা ছিল, সেইখানেই উঠতাম, তোমাদের নিমন্ত্রণই গ্রহণ করতাম না। যাক্ গে, সে কথা আর এখন ব'লে লাভ নেই।

আমি বিনীত ভাবে বললাম, আপনি এজন্য আমাকে অপরাধী করবেন না ; এ সকল ব্যবস্থা-বন্দোবস্তের জন্য দায়ী রাণী আর সুশীলা-দিদি।

রাণী বলল, আমরা এমন কি ব্যবস্থা করেছি, যার জন্য আপনি আপত্তি করছেন।

সাহেব বললেন, আপত্তি করছি নে ; যা করেছ তা তোমাদের উপযুক্তই হ'য়েছে। কিন্তু, একটা কথা বলে রাখি, আমার জন্য বিলাতী খানার ব্যবস্থা কোরো না। অনেকদিন এ দেশ ছেড়েছি, বাঙ্গালা দেশেও অনেকদিন যাই নি। যে কয়দিন এখানে থাকব, রাণী আর সুশীলার বাঙ্গালা রান্নাই আমার আহার হবে। আমি তোমাদের ডাল-চচ্চড়ি খেতে বড় ভালবাসি, জান্‌লে সুশীলা !

দিদি বললেন, বেশ, তাই হ'বে ; এখন তো একটু চা খান ; তারপর সে ব্যবস্থা হবে। তিনকড়িমামা সে কথা আগেই ব'লে রেখেছিল।

সাহেব বললেন, তোমরা আমাকে এখনও ভাল ক'রে চেন নাই। কিন্তু সেই কতদিন আগে দিন কয়েকের জন্য তিনকড়ির সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল ; সেই সময়ই ও আমাকে চিনে ফেলেছিল, আমিও ওকে চিনেছিলাম। এতদিনেও আমি তিনকড়িকে ভুলি নি ; আর তারই জন্য এত লোক থাকতে আমি ঐ যুবক তিনকড়ির উপরই সুশীলার ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে দেশে চলে গেছলাম।

তিনকড়ি বলল, অযোগ্য ব্যক্তির উপর ভার দিলে যা হয়,

তাই হ'য়েছে ; সুশীলা মায়ের জন্ত আমি কিছুই করতে পারি নি। যখন ঘোর বিপদে পড়ে আমার সাহায্য চেয়ে পত্র লিখেছিল, তখন কল্‌কাতা থেকে ছুটে সাজাহানপুরে গিয়েও তার বিপদে উদ্ধার করতে পারি নি। হরিদ্বারের আশ্রমে যখন সুশীলা ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ করেছিল, তখনও তার মত পরিবর্ত্তন করাতে পারি নি। এখনও যে তার জন্য কিছু করতে পারব, তা আমার মনে হয় না ; সুতরাং আমার দ্বারা কোন কাজ হয় নি, হ'বার সম্ভাবনাও নেই।

ডাক্তার সাহেব বললেন, তোমার সাধ্য কতখানি, তা তোমার চাইতে আমি বেশী জানি তিনকড়ি। সে-সব কথা এখন নয়। বুড়া মানুষ, সুদীর্ঘ পথ একটানে ট্রেণে এসেছি। একটু ক্লান্তি বোধ হচ্চে। এখন আমার বিশ্রামের দরকার হয়েছে। সব কথা বিকেলে, না হয় সন্ধ্যার পর হবে।

আমি বললাম, চল, সবাই আমরা যাই, উনি বিশ্রাম করুন। এই বলে সকলকে নিয়ে আমি বাগান-বাড়ী থেকে বেরিয়ে এলাম।

বিকেল-বেলায় ডাক্তারসাহেব তিনকড়িকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে গেলেন। যাবার সময় আমাকে ডেকে বললেন, হরেন্দ্র, তোমাদের রাত্রের ডিনার একটু সকাল-সকাল শেষ কোরো। রাত্রিতে আমার অনেক কথা জানবার আছে।

আমি বললাম, আমরাও সুশীলা-দিদির সম্বন্ধে অনেক কথা জানি নে ; রাত্রিতে সে-সব শোনা যাবে। আর অতঃপর দিদির কি করা কর্ত্তব্য, সে-সম্বন্ধেও আপনার আদেশ পাওয়া দরকার। তার জন্যই টেলিগ্রাম ক'রে তিনকড়ি আর তার দিদিকে

আনিয়েছি। আমাদের সৌভাগ্যক্রমে আপনিও ঠিক সময়ে এসে পড়েছেন।

ডাক্তারসাহেব বললেন, সে-সব কথা রাত্রিতে হ'বে। এখন আমি একটু বেড়িয়ে আসি। এই ব'লে তিনকড়িকে সঙ্গে নিয়ে তিনি বেড়াতে গেলেন।

সেদিন রাত্রি সাড়ে-আটটার মধ্যেই সকলের আহার শেষ করতে হ'ল। ডাক্তারসাহেব অতি সামান্য জলযোগ করলেন; সাহেবী প্রথায় সন্ধ্যার পর ডিনার করলেন না।

ন'টা বাজ্‌তে না বাজ্‌তেই সকলে আমাদের বাগানের ঘরে উপস্থিত হ'লেন। রাণীই প্রথমে কথা বলল, আজকের আমাদের এই মহাসভার সভাপতি ডাক্তারসাহেব হোন, আমি এই প্রস্তাব করছি।

স্বামী আত্মানন্দ সহাস্য-বদনে দণ্ডায়মান হ'য়ে বললেন, শ্রীমতী রাণী দেবীর প্রস্তাব আমি সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করছি। আমাদের আজকের এই সভার কার্য্য-পরিচালনা করবার উপযুক্ত ব্যক্তিই তিনি।

তিনকড়ি বসে-বসেই বলল, এর উপরে আর কথা নেই। কিন্তু, আমি বলি কি, ও-সব সভাপতি, সভাপত্নীর কোন প্রয়োজনই নেই। সুশীলা-মা তার মনের ইচ্ছা প্রকাশ করে বলুক, তারপর ডাক্তারসাহেব যা বলবেন, তাই সুশীলা মাথা পেতে স্বীকার করবে, আমরাও জয়ধ্বনি করব। ও-সব কথা-কাটাকাটি আমি বুঝিনে। ঐ যে কল্‌কাতায় এক রাত-ভিখারী এক দিন

আমাদের দোকানের সুমুখে গান করেছিল, "অত বোঝাপড়ার কাজ নেই রে মন, বোঝো সোজা, চল সোজা।" ভিখিরীর ঐ কথাই আমি বেদবাক্য করেছি—বোঝ সোজা, চল সোজা।

ডাক্তারসাহেব বললেন,—তিনকড়ি, তুমিই ঠিক কথা বলেছ—বোঝ সোজা, চল সোজা। এর চাইতে ভাল উপদেশ আর নেই। এখন সুশীলা, তুমি বল তো, সতীশের মৃত্যুর পর থেকে এ পর্য্যন্ত তুমি কি করেছ? সব কথা খুলে বল দেখি।

সুশীলা-দিদি অতি ধীরভাবে বলল, আপনি যখন আদেশ করেছেন, তখন আমাকে তা পালন করতেই হ'বে। কিন্তু, কন্যা হ'য়ে পিতার দুর্ব্বলতার কথা বলতে যে আমার বড়ই কষ্ট হ'বে। উপায় নেই, আমার জীবনের এই অধ্যায়টা আপনাদের অজ্ঞাত থাকলেই ভাল হ'ত।

ডাক্তারসাহেব বললেন, তোমার যদি কষ্ট বোধ হয়, তা হ'লে সে কথা নাই বা বললে। কিন্তু, দুই বৎসর হরিদ্বারে আশ্রমে অমন মহাত্মার আশ্রয় ত্যাগ করে হঠাৎ তুমি চ'লে এলে কেন, সেই কথাটা আমরা জানতে চাই।

আত্মানন্দ স্বামী বললেন, সে কথা ওঁর চাইতে আমিই ভাল ক'রে বলতে পারব। আশ্রমে উনি আমাকে সব কথা খুলে বলেছিলেন। এই ব'লে আত্মানন্দ স্বামী, সুশীলা-দিদির সঙ্গে তাঁর যে আলোচনা হ'য়েছিল, সে কথা আদ্যোপান্ত বললেন।

স্বামীজির কথা শেষ হ'লে সুশীলা-দিদি বলল, আমার যা

বলবার ছিল, আনন্দ তা বলেছেন। এখন আপনারা আমার কর্ত্তব্য স্থির করুন।

তিনকড়ি বলল, এই মূর্খ তিনকড়িকে যদি জিজ্ঞাসা করেন ডাক্তারসাহেব, তা হলে আমি বলব, আর সে কথা আজ সকালেও বলেছি, যে সুশীলা-মা আমাদের সঙ্গে কল্‌কাতায় গিয়ে আমরা যেমন আছি তেমনি থাকুক। ও-সব বড় বড় কথ আমি বুঝি নে। বড়-দিদি আর সুশীলা-মা যদি আমার পিছনে থাকে, আর দিন-রাত আশীর্ব্বাদ করে, তা হ'লে এই যে তিনকড়ি মিত্তিরকে দেখছেন, ইনি মানুষ হ'য়ে যাবেন। অতএব তিনকড়িকে মানুষ করাই আপাততঃ সুশীলা-মায়ের কর্ত্তব্য। তারপরে যা হয় সে পরে দেখা যাবে। এই হ'ল আমার কথা। তবে বলেছি তো, ডাক্তারসাহেব যা বলবেন, আমরা তা মাথা পেতে নেব, কোন আপত্তি করব না।

আমি বললাম, ডাক্তারসাহেব যদি বলেন, তিনকড়ি, তুমি সকলকে নিয়ে কল্‌কাতায় যাও। সেখানে গিয়ে তোমার বড়-দিদি একটী সুন্দরী মেয়ে দেখে-শুনে তোমার বিয়ে দেবেন; আর সুশীলা-দিদি তোমার সেই বৌকে নিয়ে ঘর-সংসার করবেন, তা হ'লে তোমাকে তা মাথা পেতে নিতে হ'বে।

তিনকড়ি লাফিয়ে উঠে বলল, দেখুন দেখি, ডাক্তার কোন্ কথার মধ্যে কি কথা এনে ফেললেন। আমার কর্ত্তব্য নিয়ে তো কথা হচ্চে না, কথা হচ্চে সুশীলা-মায়ের কর্ত্তব্য নিয়ে। তার মধ্যে আমার কথা কেন? আমি কে?

ডাক্তার সাহেব বললেন, তুমি কে, এই কথা জিজ্ঞাসা করছ তিনকড়ি? আমি এ জিজ্ঞাসার উত্তর দিচ্ছি। তোমরা হয় তো শোন নি যে, যখন আমি এ-দেশে ছিলাম তখন হিন্দু-জ্যোতিষ-সম্বন্ধে আমি কিছুদিন আলোচনা করেছিলাম। একজন হিন্দু-সন্ন্যাসীর সাহায্যও সে সময় পেয়েছিলাম; তিনি আমাকে মানুষের করকোষ্ঠী বিচারের পথ দেখিয়ে দিয়েছিলেন। তারপর কিছু দিন নানা কারণে জ্যোতিষের চর্চ্চা আমি ছেড়ে দিয়েছিলাম। সুশীলা যখন পীড়িত হ'য়ে সাজাহানপুরে আসে, তখন আমি সেখানে ছিলাম এবং সুশীলার চিকিৎসার ভার সতীশ আমার উপর দিয়েছিল, এ কথা তোমরা জান। সেই সময় আমি হঠাৎ সুশীলার হাত দেখেছিলাম, এবং পূর্ব্বের শিক্ষার ফলে আমি তার কর-কোষ্ঠীর বিচার করেছিলাম। সুধু সুশীলার কেন, আমি তখন সতীশ ও তিনকড়ির হাতও দেখেছিলাম। তারপর যখন আমি ছুটী নিয়ে বিলাত যাই, সেই সময় সতীশকে সব কথা বলেছিলাম। তিনকড়ির উপরই তখন আমি সুশীলার রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিয়েছিলাম। সতীশের জীবন-কাল যে তখন সংক্ষেপ হ'য়ে এসেছিল, তা আমি তার কর-কোষ্ঠী বিচার করে জানতে পেরেছিলাম। তাই সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত পাত্র হ'লেও আমি তার উপর সুশীলার ভার দিই নাই। সে সময় আমি সুশীলার জন্য ব্যাঙ্কে সামান্য কিছু টাকা জমা করে দিয়েছিলাম এবং সে-টাকা ব্যয় করবার অধিকার তিনকড়িকে দিয়েছিলাম; তবে ব্যাঙ্কের উপর আমার আদেশ ছিল যে, টাকা জমা দেবার

পর দেড় বছরের মধ্যে যেন তিনকড়িকে এ সংবাদ না দেওয়া হয়, কারণ আমি সুশীলার হাত দেখে বুঝতে পেরেছিলাম যে, আরও কিছু বিপদ তার হ'বে এবং তিনকড়ি সে সময় তাকে কোন সাহায্যই করতে পারবে না। এই মাসকয়েক আগে তিনকড়ি ব্যাঙ্ক থেকে সংবাদ পেয়েছে। কেমন তিনকড়ি, তুমি সংবাদ পাও নাই।

তিনকড়ি বলল, হ্যাঁ, আমি সংবাদ পেয়েছিলাম। সে-কথা এত দিন কাউকে বলি নি; আজ যখন বলব ব'লে মনে করেছিলাম, তখন আপনার আগমনের সংবাদ পেয়ে কথাটা চেপে গেছলাম। সকলে ও-কথাটা আপনার মুখ থেকেই শুন্‌বেন, তাই আমি বলি নি।

ডাক্তারসাহেব বললেন, বেশ করেছিলে। তারপর আরও কথা শোনো। সুশীলার পিতা দীনেশ বাবুর হাত আমি দেখি নি, কিন্তু, তার চেহারা দেখেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম, লোকটা ভাল নয়। ভবিষ্যতে তার দ্বারা যে অনর্থ ঘটতে পারে, সে কথা আমি তখন সতীশকে বলেছিলাম। সুশীলা যদিও বিশেষ বিবরণ বলতে কষ্ট বোধ করল, তা হ'লেও আমি কেন, তোমরাও বুঝতে পেরেছ যে, সুশীলার অকস্মাৎ সাজাহানপুর থেকে চ'লে যাবার কারণ তার বাবা। যাক্ সে কথা। আজও বিকেলে আমি কৌশলে সুশীলার হাত দেখেছি; সুশীলা তা বুঝতে পারে নি। সন্ধ্যার পূর্ব্বে তিনকড়িকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াবার সময় তার হাতও আমি দেখেছি। আমার স্ত্রীর মৃত্যুর পর থেকে আমি আবার জ্যোতিষের চর্চ্চা আরম্ভ করেছি। বিলেতে অনেকের ঠিকুজি

মিলিয়েছি, অনেকের করকোষ্ঠী বিচার করেছি। পূর্ব্বে যতটুকু শিক্ষালাভ করেছিলাম, এখন তার থেকে আরও বেশী অভিজ্ঞতা লাভ করেছি। সুতরাং সুশীলার ভবিষ্যৎ-সম্বন্ধে আমি কিছু নির্দ্দেশ করতে পারব। এর জন্য আমাকে একটু সময় দিতে হ'বে। ঐ যে ষ্টীল ট্রাঙ্কটা দেখছ, ওর মধ্যে আমার কাপড়-চোপড় নেই, আছে কতকগুলি জ্যোতিষের পুঁথি, আর আছে অনেকগুলি হাতের আলোক-চিত্র ও ঠিকুজি। আমি আজ রাত্রিতে সেই সব আর একবার পরীক্ষা করব এবং তাই নিয়ে আলোচনা করব। তা হ'লে সুশীলার করকোষ্ঠী বিচার ভাল করে করতে পারব, এবং আমি আলোচনা করে যে নির্দ্দেশ পাই, কা'ল তোমাদের জানাব। অতএব, আজ তোমাদের সভা-ভঙ্গের আদেশ দেওয়া ব্যতীত আমার গত্যন্তর নাই।

আমি বললাম, কাল রাত্রি ট্রেণে কেটেছে। আজ আর কোষ্ঠি-বিচার করে কাজ নেই। আমরা যাই, আপনি বিশ্রাম করুন। কাল আপনার ঐ ট্রাঙ্ক খুলে যা করতে হয় করবেন।

ডাক্তারসাহেব হেসে বললেন, হরেন্দ্র, তুমি কি জান না, যে, আমি হাজার চেষ্টা করলেও ঘুমুতে পারব না, আমার মাথার মধ্যে ঐ সব করকোষ্ঠীই আনাগোনা করবে।

আমি বললাম, সে কথা খুব ঠিক। তা হ'লে আমরা যাই, আপনি বাক্স খুলে বসুন, বোধ হয় আজ আর বিছানার সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎ হ'বে না।

ডাক্তারসাহেব হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়ালেন।

দশ

আমরা ঘরে ফিরে এসে ডাক্তারসাহেবের কথাই আলোচনা করতে বসলাম। তিনকড়ি বলল, ডাক্তারসাহেব বিলেত যাবার সময় কল্‌কাতার বেঙ্গল ব্যাঙ্কে যে পাঁচ হাজার টাকা জমা দিয়েছিলেন, আর আমাকেই যে সুশীলার জন্য সেই টাকা খরচ করবার অধিকার দিয়েছিলেন, সে কথা কি আমি তখন জানতে পেরেছিলাম। এই মাস পাঁচ-ছয় আগে ব্যাঙ্ক থেকে যখন আমার কাছে চিঠি এল, তখন আমি একেবারে অবাক্ হ'য়ে গেলাম। সাহেব এই দুনিয়াতে আর লোক পেলেন না, সুশীলার জন্য আমানত টাকার খরচের অধিকার দিয়ে গেলেন এই লক্ষ্মীছাড়া, মূর্খ তিনকড়ির উপর। এ যে তাঁর কি সুবিবেচনা, আমি তা ভেবেই পাই নে। আমি তখনই ঠিক করেছিলাম, আমি এ ভার নেব না; সব টাকা ব্যাঙ্ক থেকে তুলে নিয়ে হরিদ্বারে গিয়ে সুশীলাকে দিয়ে আস্‌ব। আমার মত অতি সামান্য দোকানদারকে যিনি বিশ্বাস ক'রে এত টাকা দিতে পারেন, তিনি পণ্ডিত হ'তে পারেন, কিন্তু তাঁর যে বিষয়-বুদ্ধি একটুও নেই, সে কথা আমি এক-শ বার কেন, হাজার বার বলব। কি বলেন ডাক্তারবাবু?

আমি কিন্তু বলবার আগে রাণী ব'লে উঠল, তুমি জান না তিনকড়িমামা, ডাক্তারসাহেব বাবার সঙ্গে পরামর্শ করেই এ কাজ ক'রেছিলেন। শুন্‌লে না সাহেবের মুখে, তিনি বুঝতে পেরে-

ছিলেন বাবা আর বেশী দিন বাঁচবেন না ; তাঁর উপর দিদির ভার দেওয়া, না দেওয়া বৃথা হ'বে। কাজেই তিনকড়িমামাকেই দিদির অভিভাবক ক'রেছিলেন। আর সে কাজ যে খুবই ঠিক হ'য়েছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তিনকড়িমামার মত দিদির শুভানুধ্যায়ী আর কে আছে ?

তিনকড়ি বলল, কেন, তুমি কি তিনকড়ির চাইতে কম। তোমার মা কি আমার চাইতে সুশীলার বেশী আপনার নয়। সতীশবাবুর অভাবে বৌ-দিদিই যে সুশীলার প্রধান অভিভাবক।

বড় মাসীমা বল্‌লেন, তিনকড়ির এ কথা খুবই ঠিক। সত্যই তো, বৌমা ছাড়া সুশীলার আপন জন আর কে আছে ? আমরা কে ? আমার ভগিনীপতির বাড়ীতে সুশীলা আর তার মা ভাড়াটে ছিলেন। মনে নেই তিনকড়ি, মৃতপ্রায় সুশীলাকে নিয়ে যখন আমরা প্রথম সাজাহানপুরে যাই, তখন সব কথা ভুলে গিয়ে কে সুশীলাকে কোলে তুলে নিয়েছিল। সে সতীশবাবু আর বৌমা ! সুশীলার মা কি বলেছিল তখন, তা কি আমি ভুলেছি ? সে সতীলক্ষ্মী তার মেয়ের কলঙ্ক তখনও ক্ষমা করতে পারে নাই। সে সময় ঐ বৌমা যদি আশ্রয় না দিত, তা হ'লে সেইদিনই সুশীলাকে আমরা হারাতাম।

সুশীলাদিদি বল্‌ল, সে কথা ঠিক বড় মাসীমা ! কিন্তু, কাশীর কথা ভুলছ কেন ? তোমরা যদি সেই রাত্রিতে আমাকে আশ্রয় না দিতে, তা হ'লে আমি যে পথেই মারা যেতাম।

বড় মাসীমা বল্‌লেন, ওরে পাগলী মেয়ে, আমরা বুঝি তোমাকে

আশ্রয় দিয়েছিলাম! এই বুঝি তোমার ধারণা। ভুলে গেলি মা, আর একজনের কথা! কে আমাদের কাশী নিয়ে গিয়েছিল? কে আমাদের সেই রাত্রিতে কাশীর পথে নিয়ে গিয়েছিল? সে বাবা বিশ্বনাথ! আমরা কে? আর আজ যে সাত সমুদ্র তের নদীর পার থেকে এক বৃদ্ধ সাহেব তোর জন্যে ছুটে এসেছেন, তাঁকে কে নিয়ে এসেছেন, জানিস্ মা! তিনি ঐ বিশ্বেশ্বর!

আমার শাশুড়ী এতক্ষণে কথা বল্‌লেন; তিনি বললেন, জান দিদি, তোমরা আমরা উপলক্ষ্য মাত্র। সুশীলার পুণ্যফলেই এমন সব সংযোগ হ'য়েছে। তবে, এ কথা বল্‌তে পার, সুশীলা এত কষ্ট পেল' কেন? এত ঘোর বিপদে সে পড়েছিল কেন? তার কারণ আছে দিদি! এক দিনের অবিবেচনায় ও যে কাজ ক'রে বসেছিল, তার তো প্রায়শ্চিত্ত চাই! সেই প্রায়শ্চিত্ত ওকে করতে হ'য়েছে। বাবা বিশ্বনাথ ওকে পুড়িয়ে একেবারে খাঁটি করে নিয়েছেন।

সুশীলা তাড়াতাড়ি উঠে আমার শাশুড়ীর পায়ের ধূলো নিয়ে বল্‌ল, কাকীমা, তোমারই আশীর্ব্বাদে আমি আজ তোমার পায়ের গোড়ায় এসেছি। তুমি আর সতীশকাকা, আর মাসীমা, তিনকড়িমামা, কার কথা আমি আগে বল্‌ব। আমি তো সব ছেড়ে. সব মায়া-মমতা বিসর্জ্জন দিয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করতেই গিয়েছিলাম। দুই বৎসর কি কম সাধনা করেছি? দিনরাত্রি পথ খুঁজেছি। কিন্তু, কৈ, কিছুই তো হোল না। তোমাদের স্নেহপাশ তো ছিঁড়ে ফেলতে পারলাম না। দেবতার মত স্বামী

অচলানন্দ, উদারহৃদয়, পরদুঃখকাতর এই স্বামী আত্মানন্দ—কেউ আমাকে বেঁধে রাখতে পারলেন না! আমি ছুটে এলাম তোমাদের কাছে। আমি আর নিরানন্দ সইতে পারছি নে কাকীমা! আমি চাই আমার চারিপাশে আনন্দের হাট বসাতে। আমি দেখ্‌তে চাই আনন্দময়ী মাকে! তাই আমি এখানে এসেছি! কিন্তু, আমি বেশ বুঝতে পেরেছি, আমার সাধনার কোন ফলই হয় নি। আমি পথই দেখতে পাই নি। এখন তোমরা যদি আমার পথের সন্ধান দিতে পার, তা হ'লেই আমি বেঁচে যাই।

তিনকড়ি বল্‌ল, পথ তো তোমাকে দেখিয়েই দিয়েছি; তুমি যে সে পথে যেতে চাও না। তোমাকে নিয়ে ভারি মুস্কিলে পড়া গেছে সুশীলা! আমি তো তোমার কথা বুঝতেই পারি নে। কি যে তুমি বল, কি যে তুমি চাও।

সুশীলাদিদি বল্‌ল, আমি কি চাই, জান তিনকড়িমামা! আমি যত শীগগির হয় মরতে চাই; আর সেই মরণ আস্‌বার যে কয়দিন বিলম্ব আছে, সে কয় দিন প্রাণ খুলে আনন্দ করতে চাই। তারই জন্য আমি হরিদ্বার ছেড়ে চ'লে এসেছি। সে আনন্দহীন স্বর্গভোগ আমার ভাল লাগল না। আমার এ কথার সাক্ষী ঐ যে ধ্যানস্থ অবস্থায় বসে আছেন ঐ আনন্দ!

আত্মানন্দ বললেন, আমাকে সাক্ষী মেনে কি হ'বে? তোমার অদৃষ্টে আরও কি ভোগ আছে, তা ঐ বাগানবাড়ীতে বসে জ্ঞানবৃদ্ধ জ্যোতিষী মহাশয় রাতের মধ্যে গণনা করে ঠিক করবেন। তিনি যা বলবেন, অর্থাৎ তিনি যা ভবিষ্যদ্‌বাণী

করবেন, তুমি চাও আর না চাও, তোমাকে তাই করতে হ'বে; ভবিতব্য তোমার জন্য যা ব্যবস্থা ক'রে রেখেছেন, তার অন্যথা তুমি করতে পারবে না। তার মধ্যে আনন্দ থাকে, বেশ, সেই আনন্দকেই তোমাকে বরণ করে নিতে হ'বে; আর তার মধ্যে যদি নিরানন্দ থাকে, আরও পরীক্ষার ব্যাপার থাকে, তোমার সাধ্য হ'বে না, তা এড়িয়ে যাও।

আমি বললাম, অতএব, বৃথা বাক্যব্যয়ে কোন প্রয়োজন নেই; এখন যাঁর যেখানে আস্তানা হ'য়েছে, তিনি সেখানে গিয়ে বিশ্রাম করুন। কাল সাহেবের কাছে যখন ভবিষ্যতের কথা জানতে পারা যাবে, তখন আজকের রাতটা চোখ বুঁজে কাটাতেই হ'বে।

আমার কথা শুনে সকলেই যাঁর যাঁর শয়ন-স্থানে চ'লে গেলেন। তখন রাণী বলল, দেখ, রাত প্রায় বারোটা বাজে; শঙ্কর তো তার মাসীমার কাছে আছে। এখন চল না একবার দেখে আসি ডাক্তারসাহেব কি করছেন। তিনি হয় তো এতক্ষণ জেগে নেই। যাই হোক, চল একবার দেখে আসি।

আমি বললাম, আমার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু বাগান-বাড়ীতে গিয়ে যদি দেখা যায় যে, ডাক্তারসাহেব এখনও জেগে আছেন, আর তাঁর অমূল্য পুঁথির মধ্যে নিবিষ্টচিত্ত আছেন, তা হ'লে কিন্তু নিঃশব্দে চ'লে আসতে হ'বে। তুমি যে তাঁর উপর এই রাত বারটার সময় চড়াও হ'বে, তা কিন্তু হচ্ছে না।

রাণী বলল, তাই হ'বে, এখন চল।

তখন আমরা দুইজনে নিঃশব্দে বাগানের দিকে গেলাম। দূর থেকে দেখ্‌তে পেলাম, বাগানের ঘরে আলো জ্বলছে, দুয়ার-জানলা এত শীতের মধ্যেও খোলা রয়েছে। আমরা বাগান থেকে আস্‌বার সময় সব দুয়ার-জানলা বন্ধ ক'রে দিয়ে এসেছিলাম। তারপর সাহেব বোধ হয় খুলে দি:য়ছেন।

আর বেশী দূর যেতে হ'ল না। বাগানবাড়ীর সুমুখে যে রাস্তা, সেই রাস্তায় উঠতেই দেখি, ডাক্তারসাহেব রাস্তার মাঝখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন। তখন আমরা কি করব ভাবছি, এমন সময় ডাক্তারসাহেব ফিরে দাঁড়ালেন এবং অনতিদূরে আমাদের দুই মূর্ত্তি দেখে বল্‌লেন, কে গো তোমরা?

তখন আর কি করা যায়; আমরা দুইজনেই এগিয়ে গেলাম। ঘরের আলো এসে রাস্তায় পড়েছিল; সেই আলোকে আমাদের চিনতে পেরে ডাক্তারসাহেব এগিয়ে এসে বললেন, এই দারুণ শীতের মধ্যে তোমরা বেড়াতে বেরিয়েছ। আশ্চর্য্য, ঠাণ্ডা লেগে অসুখ করবে যে?

রাণী হেসে বল্‌ল, রাত বারোটা যে শীতকালে বেড়াবার সময় নয়, তা জানি। আমরা দেখ্‌তে এসেছি, আমাদের বৃদ্ধ অতিথি এখন কি করছেন?

সাহেব বল্‌লেন, যা দেখা-শোনা, পড়া, কোষ্ঠী মিলান, তা আমার শেষ হ'য়ে গেছে। বুড়া মানুষ, একটু ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছিলাম, মাথাটাও একটু গরম হ'য়েছিল, তাই দুয়ার-জানলা খুলে দিয়ে বাগানে এসে দাঁড়িয়েছিলাম। তোমাদের দেশের

এ শীত যতই বেশী হোক, বিলাতের সঙ্গে তুলনায় এ কিছুই নয়। দেখ, আমার ইচ্ছে হচ্ছিল তোমাদের নিয়ে একবার ইউরোপে যাই। আমাদের দেশটা দেখিয়ে আনি। যাবে রাণী, আমার সঙ্গে বিলেতে? যাবে হরেন্দ্র?

আমি বল্‌লাম, হঠাৎ এমন ইচ্ছা আপনার হলো কি ক'রে?

ডাক্তারসাহেব বল্‌লেন, তার কারণ আছে। আমি সুশীলার করকোষ্ঠী আলোচনা করে দেখলাম, তার শিক্ষালাভের জন্য বিদেশ-ভ্রমণ যোগ আছে। সে যোগের সঙ্গে আমার যে সংযোগ আছে, তা আমি বেশ বুঝতে পারলাম। এই বাগানের মধ্যে বেড়াতে বেড়াতে আমি সেই কথাই মনে মনে আলোচনা করছিলাম, এমন সময় তোমরা এসে পড়লে। সুমুখে তোমাদের দুইজনকে পেয়ে আমার মনে হলো, তোমাদের নিয়ে একবার বিলেত যাই না কেন; সুশীলাকে যে যেতেই হ'বে, তা তো গণনাতেই পেলাম। বেশ তো, চল না সবাই। হরেন্দ্র, তোমার তাতে লাভই হ'বে। তুমি যদি বিলাত থেকে একটা বড় রকম উপাধি নিয়ে আসতে পার, তা হ'লে তোমার পসার আরও বেড়ে যাবে; শিক্ষাও যে বেশী হ'বে, সে বিষয়েও সন্দেহ নাই।

রাণী বল্‌ল, আপনি কি গণে পেলেন যে, দিদিকে বিলাত যেতেই হ'বে? কেন যেতে হ'বে, সেখানে গিয়ে দিদি কি করবে, কি শিক্ষা করবে, তা বল্‌তে পারেন।

সাহেব বল্‌লেন, পারি বই কি! হিন্দু-জ্যোতিষ অনেক কথা বলতে পারে রাণী! শুনবে—সুশীলা কোনদিন সংসারধর্ম্ম

করবে না, ঘর-গৃহস্থালীতে ওর মন বস্‌বে না, এ আমি তার অসুখের সময়ই তার করকোষ্ঠী দেখে জান্‌তে পেরেছিলাম; তাই তখন তার ইচ্ছামত ব্যয়ের জন্য তিনকড়ির হাতে পাঁচ হাজার টাকা দেবার ব্যবস্থা করে গেছলাম। জান, সুশীলা কেন স্বামিজীর আশ্রম ছেড়ে এসেছে? আশ্রম ওর জন্য নয়। আত্মানন্দের কাছে আমি বিকেলে শুনেছি, সুশীলা চায় আনন্দ! সাংসারিক আনন্দ নয়, ও চায় পরমানন্দ! সে আনন্দ ও কিসে পাবে, তা আমি বল্‌তে পারি; আর্ত্তের সেবাতেই সুশীলা পরমানন্দ পাবে—আর কিছুতেই ওর প্রাণের আশা মিট্‌বে না। সেই সেবাব্রতের উপযুক্ত করবার জন্য ওর শিক্ষার দরকার। ওকে বিলাতে নিয়ে গিয়ে আমি ধাত্রী-বিদ্যা ও রোগিনীর সেবাপদ্ধতি শিখাবার ব্যবস্থা করব। আমি স্থির ক'রেছি, সেখানে নিয়ে গিয়ে প্রথম ছয় মাস ওকে আমার কাছে রেখে ইংরেজী ভাষা এবং চিকিৎসাশাস্ত্র সম্বন্ধে আমি যা সামান্য জানি, তা শিক্ষা দেব। তারপর ওকে খুব বড় একটা স্ত্রীলোকদের হাসপাতালে প্রবিষ্ট করিয়ে দিয়ে ধাত্রীবিদ্যা ও রোগিনী-পরিচর্য্যা-সম্বন্ধে শিক্ষালাভের ব্যবস্থা করব। সুশীলার যে রকম মেধা, তাতে দুই বছর আড়াই বছরের মধ্যেই ও বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করবে। এই সময় সুশীলার উপর একটা দুষ্ট গ্রহের প্রকোপ দেখতে পাওয়া যায়। সেটা যদি কেটে যায়—যাবে ব'লেই আমার মনে হ'য়—তবে আমি ঠিক বল্‌তে পারছি নে। ঐটে কেটে গেলে ওকে আমি বাঙ্গলাদেশে, ওর প্রিয় জন্মভূমিতে

পাঠাব এবং আমার যা কিছু সঞ্চয় আছে, সব দিয়ে বাঙ্গলা দেশে মেয়েদের জন্য একটা হাসপাতাল ক'রে দেব। সুশীলা সেই হাঁসপাতালের অধিষ্ঠাত্রী হ'য়ে যে আনন্দের জন্য ও কাঙ্গালের মত ছুটে এসেছে, সেই অতুল আনন্দের অধিকারিণী হ'বে। তারই জন্য এই বৃদ্ধ বয়সে ভগবান্ আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন; এ কথা আমি বিশ্বাস করি। এ সেই বিশ্ব-বিধাতারই অভিপ্রায়! সেই জন্যই বলছিলাম, তোমরাও চল না আমার সঙ্গে। সংসারে আমার কেউ নেই। চাকরী ক'রে অনেক টাকা আমি জমিয়েছি, জীবনবীমা ক'রেও অনেক টাকা আমি পেয়েছি। এত টাকা আমি কি করব, সেই কথা যখন-তখন ভাবতাম। ভগবান্ আমার সেই সঞ্চিত অর্থ সদ্ব্যয় করবার পথ দেখিয়ে দিলেন। সুশীলার প্রতি যেমন আমার কর্ত্তব্য আছে, তেমনই আমার অতি প্রিয়বন্ধু পরলোকগত সতীশের মেয়ে-জামাইয়ের প্রতিও আমার একটা কর্ত্তব্য আছে। সেই কর্ত্তব্যের অনুরোধেই হরেন্দ্র, তোমাকে বিলাত যেতে বল্‌ছি; আর তোমার হৃদয়ে শক্তি সঞ্চার করবার জন্য রাণী আর ভবশঙ্কর তোমার সঙ্গে যাবে। দেখ, আর এই শীতের মধ্যে দাঁড়িয়ে থেক না, ঘরে যাও। আমি তোমাদের দুই জনের কাছে আমার সিদ্ধান্ত জানিয়ে নিশ্চিন্ত হ'লাম; এখন আমি ঘরে গিয়ে অকাতরে নিদ্রা দিতে পারব। তোমরা যাও, আমি এখনই ঘুমিয়ে পড়ব। কাল সব কথা ঠিক হবে। এই বলে ডাক্তারসাহেব তাঁর শয়ন-ঘরের দিকে অগ্রসর হ'লেন;

আমরাও যথারীতি তাঁর শুভ কামনা ক'রে ঘরে ফিরে এলাম।

পথের মধ্যেই রাণী বল্‌লে, আমাদের অনেক কথা ভাবতে হ'বে, কেমন ?

আমি বল্‌লাম, এত রাত্রে আর ভাবলে চল্‌ছে না। ঘরে গিয়ে ডাক্তারসাহেবের মত অকাতরে নিদ্রা দাও। কাল শ্রীমান্ ভবশঙ্করের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে আমাদের কর্ত্তব্য স্থির করা হ'বে।

রাণী বল্‌লে, সেই ভাল ; শঙ্করই শ্রেষ্ঠ পরামর্শদাতা।

পরদিন প্রাতঃকালে আমাদেরই বৈঠকখানায় ডাক্তারসাহেব চায়ের মজ্‌লিস করলেন। তবে মজ্‌লিস বেশ জমল না, কারণ আমি আর রাণী ছাড়া বাড়ীতে চা-খোর কেউ ছিল না। তিনকড়িকে ডাক্‌তে সে ব'লে উঠ্‌ল, দোকানদার মানুষ, অতি ক্ষুদ্র জীব। দু'বেলা যে দু'টো ভাতের সংস্থান করতে পারি, সেই আমার সৌভাগ্য। তার পরে আবার চা! ও বাবুগিরি লজেঞ্চুস্‌ বেচনেওয়ালার পোষায় না; ও সব আপনাদের জন্য, গরীব তিনকড়ি ও-রসে বঞ্চিত।

আত্মানন্দকে বল্‌তে গেলাম, সে হেসে বল্‌ল, আজ চা খাই, কাল সিগারেট ধরি, তার পর দিন ব্যোম ভোলানাথ। তা হ'লেই আমার বেদান্তের বাপান্ত হ'য়ে যাবে। এই কয়েকদিনের সেবাতেই আমি একেবারে হাঁপিয়ে উঠেছি। এখন স্থান ত্যাগেন দুর্জ্জনঃ। এ সব মহাজনের সঙ্গে বাস করা আমার আর পুষিয়ে উঠ্‌ছে না। ডাক্তারবাবু! আমার ছুটী মঞ্জুর করুন; আমি আশ্রমে ফিরে যাই।

সুশীলা দিদি বল্‌লেন, আমার অদৃষ্ট লিপি পাঠ না করেই তুমি চ'লে যেতে পারবে আনন্দ!

আত্মানন্দ বল্‌লেন, তা পারছি নে বলেই তো আটকে পড়ে আছি। তোমার হাতে প'ড়ে আমার যে সাধন-ভজন মাথায় উঠ্‌বার যো হ'ল; তোমার নিত্যানন্দের বেগ্‌ সামলাতে

আত্মানন্দকে হাবুডুবু খেতে হ'বে। এখন ভাবছি, তোমার যা হয় একটা গতি স্থির হ'লেই আমি চ'লে যাই।

সুশীলা দিদি বল্‌লেন, চ'লে যেতে তুমি পারবে আনন্দ! তোমাকে কেউ আটক করতে পারবে না। কিন্তু, সত্য কথা বল তো আনন্দ, তুমি আশ্রমে গিয়ে নিশ্চিন্ত মনে তোমার বেদান্তের আলোচনা করতে পারবে? আশ্রম-প্রান্তের আমার পর্ণকুটীর, কুটীরের সম্মুখের নিম গাছের ছায়া কি সুশীলার কথা তোমাকে স্মরণ করিয়ে দেবে না আনন্দ!

আত্মানন্দ বল্‌লেন, গুরুদেব সে কথা বল্‌তে পারেন। আমি তাঁর আদেশ প্রতিপালন করেছি, এখন তাই করব।

ডাক্তারসাহেব বল্‌লেন, স্বামীজি, আমি বলি কি, আপনি আশ্রমে গিয়ে আপনার গুরুদেবের অনুমতি নিয়ে এসে আমাদের সঙ্গে বিলাতে চলুন না!

আত্মানন্দ হেসে বল্‌লেন, ডাক্তারসাহেব, 'আমাদের' শব্দটা বহুবচনে প্রয়োগ করতে হয়।

ডাক্তারসাহেব বল্‌লেন, আমি বহুবচনেই ও শব্দটা ব্যবহার করেছি।

সুশীলা-দিদি বল্‌লেন, কথাটা তো আমিও বুঝতে পারছি নে। আপনি কি শীঘ্রই বিলাতে ফিরে যাবেন? আপনি যে পত্র লিখেছিলেন, তার থেকে আমরা বুঝতে পেরেছিলাম আপনি জীবনের অবশিষ্টকাল আমাদের সঙ্গেই কাটাবেন। এখন আবার 'আমাদের' এল কেমন করে?

ডাক্তারসাহেব বল্‌লেন, আমার সে সঙ্কল্প স্থিরই আছে ; আমি তোমার সঙ্গেই জীবনের অবশিষ্ট কাল কাটাব ; কিন্তু আপাততঃ তোমাকে নিয়ে আমি কিছুদিনের জন্য বিলাতে যাওয়া স্থির করেছি।

সুশীলা-দিদি অবাক্ হ'য়ে বল্‌লেন, আমি যাব বিলেতে ! কেন, এত বড় ভারতবর্ষে কি অভাগীর জন্য একটু স্থান মিলবে না ! আর আমি বিলেতে কি করতে যাব ? এ যে অসম্ভব কথা !

এইবার রাণী কথা বলল, পৃথিবীতে অনেক অসম্ভব সম্ভব হ'য়ে থাকে। কাল রাত্রে ডাক্তারসাহেব আমাদের কাছে বলেছেন, তোমাকে বিলাতে যেতেই হ'বে। সেখানে গিয়ে ধাত্রীবিদ্যা শিখে এসে বাঙ্গলা দেশে গিয়ে তুমি হাজার হাজার দরিদ্রা রোগিনীর জগদ্ধাত্রী হ'য়ে আনন্দের হাট বসাবে, এই তোমার অদৃষ্টলিপি দিদি !

সুশীলা-দিদি এই কথা শুনে চোখ বুজে কি যেন ভাবতে লাগলেন। একটু পরেই বললেন, এই কি আমার পথ ! আপনি কি আমার জন্য এই পথই নির্দ্দেশ করছেন। আমি কিন্তু অন্ধকার দেখছি। কৈ, আলোর তো সন্ধান পেলাম না। বড় কাকীমা, কাকীমা, রাণী, জামাইবাবু, আলো কৈ ? তিনকড়িমামা, আনন্দ, আমার মনের অন্ধকার দূর ক'রে দাও তো ! ডাক্তার সাহেব এই কি আপনার আদেশ ? বলুন, এই কি অভাগীর পথ ? এই ব'লে সুশীলা-দিদি আবার চোখ বুঁজলেন। আমরা অবাক্ হ'য়ে তাঁর দিকে চেয়ে রইলাম। আমার মনে হ'তে লাগল দিদি অন্ধকারের মধ্যে আলোর অনুসন্ধান করছেন।

প্রায় পাঁচ মিনিট এই ভাবে কেটে গেল; আমরা দিদির মুখের দিকে চেয়ে বসে থাকলাম। তারপর তিনি সেই মুদিত-নেত্রে থেকেই কি যেন বললেন; সে কথা এমন অস্পষ্ট যে আমরা কেউই তা বুঝতে পারলাম না। ডাক্তার-সাহেবের দিকে চেয়ে দেখলাম, তিনি সুশীলা-দিদির মুখের উপর স্থির-দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে রয়েছেন। এ এক আশ্চর্য্য ব্যাপার!

একটু পরেই সুশীলা-দিদি ধীর গম্ভীর স্বরে ব'লে উঠলেন—তমসো মা জ্যোতির্গময়!

এই বয়সে কম দেখি নি, অল্প-বিস্তর পড়াশুনাও যে না করেছি; তা নয়! কিন্তু, স্বীকার করছি এমন দৃশ্য কখন দেখি নি, কখন পড়ি নি,—ঘোর অন্ধকার-সাগরে পড়ে আলোর জন্য এমন কাতর নিবেদন, প্রাণের গভীরতম প্রদেশ থেকে উত্থিত এমন আকুল প্রার্থনা আমি কখনও শুনি নি। আমি একেবারে স্তম্ভিত হ'য়ে গেলাম। শুধু আমি নই, সেখানে যে যে উপস্থিত ছিলেন, সকলের হৃদয়েই এক অপার্থিব প্লাবন এসে উপস্থিত হ'য়েছিল। মনে হ'ল, সকলেই যেন তারস্বরে বলছেন—আলো, আলো—কোথায় আলো!

কতক্ষণ এ ভাবে কেটেছিল, বলতে পারি নে; অকস্মাৎ রাণীর সুমধুর কণ্ঠস্বরে সকলের চেতনা সঞ্চার হ'ল। রাণী গেয়ে উঠল—

"ঐ যে দেখা যায় আনন্দধাম
অপূর্ব্ব শোভন,
ভব-জলধির পারে জ্যোতির্ম্ময়!'

এ॰ কি আশ্বাসের বাণী! কি প্রাণস্পর্শী সান্ত্বনা! সবারই দৃষ্টি ঊর্দ্ধ দিকে গেল; সকলেই উৎসুকভাবে কি যেন প্রত্যক্ষ করতে চাইলেন।

রাণী আবেগ-কম্পিত স্বরে যখন আবার গায়িল

ঐ যে দেখা যায়—

তখন সুশীলা-দিদি আর স্থির থাকতে পারলেন না; যে অন্ধকার-সমুদ্রে তিনি কূল-কিনারা পাচ্ছিলেন না, সেইখানে বোধ হয় আবার আশ্বাস ধ্বনিত হলো; তিনি ব'লে উঠলেন, কৈ, কৈ, কোথায় আলো।

রাণী তেমনই উচ্ছ্বসিত ভাবে বলল, ঐ যে দেখা যায়!

হায় অন্ধ মানব! আমরা যে কিছুই দেখতে পেলাম না। যিনি আলোর জন্য হৃদয়ভেদী চীৎকার করছিলেন, তিনিও দেখতে পেলেন না;—তিনিও বলতে লাগলেন কৈ, আলো কৈ?

আলোর দর্শন মিলল না! ধীরে ধীরে গভীর নিস্তব্ধতায় সমস্ত ঘর ছেয়ে গেল।

সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করলেন ডাক্তারসাহেব। তিনি বললেন, এই আলোর জন্য ব্যাকুলতাই আনন্দলোকের, জ্যোতির্ম্ময় ধামের পথ-প্রদর্শক। এখন এই অন্ধকারেরই উপাসনা করতে হ'বে। জানি না কি হ'বে; কিন্তু আমি দৃঢ়তার সঙ্গে বলছি, সুশীলাকে আমার সঙ্গে যেতে হ'বে। আমি যে পথ নির্দ্দেশ করেছি, এখন সুশীলার জন্য সেই একমাত্র পথ। আর পথের সন্ধান আমি পাই নি।

সুশীলা-দিদির তখন জ্ঞান সঞ্চার হ'য়েছে ; তিনি ডাক্তার-সাহেবের দিকে ফিরে করযোড়ে বললেন, তাই হ'বে! আপনি আমাকে যেখানে নিয়ে যাবেন, সেখানেই যাব ; যা করতে বলবেন, তাই করব।

ডাক্তারসাহেব সুশীলা-দিদির মাথায় হাত দিয়ে বললেন, তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক, হে ভগবান্!



বার

গুটী দুই রোগী দেখ্‌বার জন্য আমাকে সেদিন বিকেলে বেরুতে হ'য়েছিল। বাড়ীতে যখন ফিরলাম, তখন দেখি উপরে আমার শোবার ঘরে সবাই একত্র হ'য়েছেন। ডাক্তারসাহেব একখানি ইজিচেয়ারে অর্দ্ধ-শয়ান অবস্থায় রয়েছেন; আত্মানন্দ স্বামী একখানা কার্পেটের আসনে উপবিষ্ট; তিনকড়ি আমার বিছানায় শুয়ে পা নাচাচ্ছে; আর সবাই যে যেখানে পেরেছেন বসে আছেন।

এতক্ষণ বোধ হয় সুশীলা-দিদির সম্বন্ধেই আলোচনা হচ্ছিল। আমি যখন ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলাম, তখন রাণী বলছে, শোন মাসীমা, অনেকদিন আগে, সে বোধ হয় দশ বারো বছর হ'বে, একবার পূজার সময় মা আর বাবার সঙ্গে আমি আমাদের দেশে গিয়েছিলাম। সেই সময় একদিন এক ভিখিরীর মুখে একটা গান শুনেছিলাম। এতকাল পরে, আজ বারে বারেই সেই গানটা আমার মনে হচ্ছে। সবটা মনে নেই, গোড়াটুকু মনে আছে। ভিখিরী গেয়েছিল—

"তুই যাবি মা বাপের বাড়ী,
আমার কেন মন সরে না।
এমনি মনে হচ্ছে আমার,
গেলে দেখা আর হ'বে না।'

বল তো মাসীমা, এত গান থাক্‌তে এইটেই আমার মনে আস্‌ছে কেন ?

কেন যে মনে আস্‌ছে, তা তিনজন বলতে পারেন। এক পারেন ডাক্তারসাহেব, আর পারে রাণী, আর পারি আমি। আগের দিন রাত দুপুরে বাগানের মধ্যে দাঁড়িয়ে ডাক্তারসাহেব সুশীলা-দিদির যে রিষ্টির কথা বলেছিলেন, সে কথা তো আমরা কারও কাছে বলি নি ; ডাক্তারসাহেব নিষেধ করে দিয়েছিলেন। রাণীর মনে সেই কথাই জাগছিল। তাই সে কতদিন আগের শোনা ঐ গানটা দিয়ে তার আশঙ্কার কথা প্রকাশ কর্‌ল। কথাটা আমরা তিনজনই বুঝতে পারলাম।

রাণীর কথা শুনে আমার শাশুড়ী বললেন, কোথায় সেই সাত-সমুদ্র তের নদীর পারে সুশীলা চলে যাবে, কতদিন দেখা হ'বে না ; তাই তোমার মন অমন করছে রাণী ! কেউ কোথাও যাবে শুনলে ঐ ভাব অনেকেরই মনে হয়।

বড় মাসীমা বললেন, ঐ কথাটা শুনে অবধি আমারই প্রাণ কেমন করছে ; রাণী তো ছেলেমানুষ। আচ্ছা সুশীলা, তুমি সেই কোন্ মুল্লুক বিলেতে যেতে পারবে, এই সব ছেড়ে। তোমার মন কি এখানকার জন্য একটুও কাতর হ'বে না মা ?

তিনকড়ি শুয়েছিল, লাফিয়ে উঠে বলল, কিচ্ছু হ'বে না। ও মেয়েটার কি দয়া-মায়া ব'লে কিছু আছে। ও অভাগী একেবারেই পাষাণী। জান না বড়-দিদি, আশ্রম থেকে ঘরে ফিরিয়ে আনবার জন্য কম চেষ্টা করেছিলাম। বেটী কি কোন কথায় কাণ দিল।

ও মেয়েটা মেয়েই নয়, ওর মধ্যে যে কি আছে, তা এতদিনেও বুঝতে পারলাম না। ও যেন কিছুই গায়ে মাখে না। ঐ যে স্বামীজী বসে আছেন, উনি একদিন একটা সংস্কৃত শ্লোক বলেছিলেন; খাজা মূর্খ মানুষ, লেখাপড়া তো জানি নে, সে শ্লোকটা মনে নেই; কিন্তু তার অর্থ-টা মনে আছে; অর্থাৎ যাতে লাগিয়ে দিচ্ছ ভগবান্, তাই করছি। বলুন না স্বামীজি, সে শ্লোকটা কি? দু'টো একটা ঐ রকম শ্লোক শিখে রাখা ভাল। তেমন তেমন খদ্দের দোকানে এলে ঐ রকম দুই একটা শ্লোক ঝাড়লে চার আনার জিনিস দশ আনায় বেচতে পারব—একেবারে ডবল লাভ।

আত্মানন্দ স্বামী সহাস্য মুখে বললেন,

"ত্বয়া-হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।"

তিনকড়ি বলল, মেয়েটা ঐ 'তথা করোমি'র দলে। ওর কি বাপ-মা, ভাই-বন্ধুর উপর এক তিলও দরদ আছে?

সুশীলা-দিদি বলে উঠলেন, আর কারও উপর দরদ না থাকুক, তোমার উপর আছে তিনকড়িমামা!

তিনকড়ি বিছানা থেকে নেমে আমার কাছে এসে বলল, শুনছেন জামাইবাবু, বেটীর কথা। ওর কথা বিশ্বাস করবেন না। ও কি আমাদের কম হায়রাণ করেছে এই কয় বৎসর। এখন আদর ক'রে বলা হচ্ছে তিনকড়িমামা! জানেন জামাইবাবু, এই কয় বছরে সেই কম্বুলেটোলা থেকে আরম্ভ ক'রে কোথায় গয়া-

কাশী, মথুরা-বৃন্দাবন, সাজাহানপুর, হরিদ্বার, অবশেষে এই কানপুর; বেটী আমাদের এই ভাই-বোন দু'টীকে সারকাসের ঘোড়ার মত ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে। কষ্ট কি কম দিয়েছে। জানেন জামাইবাবু, ঐ বেটী যেদিন কম্বুলেটোলা থেকে ভূতের মত কোঁথায় অন্তর্দ্ধান করল, সেদিন থেকে তিন চারদিন এই তিনকড়ি সারাদিন না খেয়ে, সারারাত না ঘুমিয়ে কলকাতা শহর, একদিকে বরানগর কাশীপুর, আর একদিকে বেহালা-টালীগঞ্জ পাগলের মত ওকে খুঁজে বেড়িয়েছিল। দিনরাত ঐ বেটীর জন্য পথে-পথে কেঁদে ফিরেছি। তার পরের কথা আর নাই বললাম। বেটী কি সে কথা ভাবে? এখন বলছে তিনকড়ি মামার উপর দরদ আছে। যাঃ, যাঃ, বেটি—ঐ যে গান আছে—

ঢের ভালো করেছিস্ শ্যামা
আর ভালোতে কাজ নাই।
এখন, ভালোয় ভালোয় ছেড়ে দে মা!
আলোয় আলোয় চ'লে যাই॥

ডাক্তারসাহেব এতক্ষণ চুপ ক'রে এই সব কথা শুন্‌ছিলেন। তিনকড়ি যখন বলল, আলোয় আলোয় চ'লে যাই, তখন আর তিনি স্থির থাক্‌তে পারলেন না, উঠে এসে তিনকড়িকে কোলের মধ্যে জড়িয়ে ধ'রে বললেন, আলোয় আলোয় কোথা যাবে তিনকড়ি? তোমাকে যে আলো ধরতে হ'বে।

তিনকড়ি অবনত মস্তকে বলল, তা আর হলো কৈ ডাক্তার-

সাহেব? আমার মত অপদার্থের হাতে ভার দিয়ে আপনি চ'লে গেলেন বিলাতে। আমি কি ঐ মেয়ের ভার নিতে পারি? আমি পারি চিৎপুর রোডের দোকানে বসে সিগারেট বেচে দেশের ছেলেদের উৎসন্ন দিতে। কিন্তু, তাও যে ঐ সুশীলার জন্য পেরে উঠিনে। এক এক সময় নিজের উপর রাগ হয় ডাক্তারসাহেব। বলি, ও আমার কে যে, ওর জন্য ভেবে মরি। ওর সঙ্গে আমার তো কোন সম্বন্ধই নেই। কবে কিছুদিন আমার ভগিনীপতির বাড়ীর ওরা ভাড়াটে ছিল; সেই সময় একটু পরিচয় হ'য়েছিল। সেই সম্পর্কে এই কয় বছর ঐ মেয়েটা আমাকে আর আমার ঐ দিদিকে কি একদণ্ডের জন্য স্থির থাকতে দিয়েছে। এখন ও-পাপ বিদেয় হ'লেই বাঁচি। নিয়ে যান ওকে সাত সমুদ্দুরের পারে। এ তো আর হরিদ্বারও নয়, সাহাজানপুরও নয়, কানপুরও নয় যে, এক পয়সার একখানা পোষ্ট-কার্ড লিখলেই সব কাজ ফেলে ছুটে আসি।' যা সুশীলা, তোকে এবার দ্বীপান্তরে পাঠিয়ে এই তিনকড়ি মিত্র দিন কয়েক হাত-পা মেলে বিশ্রাম করুক। জানেন জামাইবাবু, আমি যে দোকান করি, সে কার জন্য। দিদির যা আছে, তাতে উনি যে কয়দিন বাঁচবেন, কোন অভাব হ'বে না। আমার আর কি? তবুও যে দোকান করি, টাকা জমাই, সে ঐ মেয়েটার জন্য। ও যে হরিদ্বারের আশ্রমে বেশীদিন থাকবে না, তা আমি জানতাম। ওখান থেকে চলে এলে ওর ভার আর কে নেবে এই তিনকড়ি ছাড়া। তাই এই দোকান করতে হ'য়েছিল। এখন বাঁচা গেল; ডাক্তারসাহেব ওর ভার নিলেন,

আমার কাজ শেষ হ'ল। এইবার দিদিকে কাশীতে রেখে দিয়ে কলকাতায় যাব। দোকান-পাট বেচে ফেলে, না হয় কাউকে দান ক'রে একেবারে হিমালয়!

সুশীলা-দিদি তিনকড়ির কথা শুন্‌ছিলেন, আর আঁচলে চোখ মুছছিলেন। তিনকড়ির কথা যখন শেষ হলো, তখন বললেন, তিনকড়িমামা, তুমি যে আমার কে, তোমরা ভাই-বোনে যে আমার জন্য কি ক'রেছ, তা কি আমি ভুলতে পারি? আমার জন্য যে তুমি গৃহী হ'য়েও সন্ন্যাসী, তা আমি জানি; কিন্তু, কি করব বল। আমি যে কি চাই, তা তোমাকে বোঝাতে পার্‌ব না। একদিন ঐ আত্মানন্দ স্বামীকে সে কথা বলবার চেষ্টামাত্র ক'রেছিলাম। দেখ মামা, এই অভাগীর কথা তোমরা ভুলে যাও। আর আমি তোমাদের বিরক্ত করতে আসব না। ঐ যে বৃদ্ধ দেখছ, আমার অবলম্বন এখন উনিই হ'বেন। আমি যা চাই, উনি তাই আমাকে দিতে পার্‌বেন, এই বিশ্বাসেই আমি ওঁর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করছি। সত্যিই তো, আমি তোমাদের কে?

তিনকড়ি আর আত্মসংবরণ করতে পারল না। যে তিনকড়ি দিনরাত হেসে খেলে আমোদ-আনন্দে কাটাতে অভ্যস্ত, সুশীলার কথা শুনে সেই তিনকড়ি একেবারে বালকের মত কাঁদতে লাগল। অনেক চেষ্টায় সেই কান্না সংবরণ করে বলল, সুশীলা, তুই যে আমার কে, সে কথা কেমন ক'রে তোকে বোঝাব। তুই যদি অমন ক'রে কম্বুলেটোলা থেকে না চলে যেতিস্, তা হ'লে যে

বাগবাজারের গুণ্ডা তিনকড়ি ছিল, তাই থাক্‌ত। কিন্তু, তুই তা থাক্‌তে দিলি কৈ মা?

ডাক্তারসাহেব বললেন, দেখ তিনকড়ি, আমি একটা কথা বলি। সুশীলাকে বিলাতে নিয়ে যাব শুনে তোমার মন কেমন ক'রছে। তা করবারই কথা। ওর মা নেই, বাপ থেকেও নেই। ওর মুখের দিকে চাইবার লোক তুমি, আর তোমার দিদি, আর ঐ সতীশের স্ত্রী। আমি বলি কি, তুমিও আমাদের সঙ্গে চল না।

তিনকড়ি একেবারে লাফিয়ে উঠল, আমি? আমি যাব বিলেতে? আপনি বুড়ো বয়সে পাগল হ'লেন না কি? আমি সেখানে গিয়ে কি কর্‌ব। আমার বিদ্যা সেই ফিপ্থ ক্লাস অবধি। কোন রকমে ইংরেজীতে নামটা সই করতে পারি, আর 'ইয়েস', 'নো' বলতে পারি। আমি গিয়ে কি কর্‌ব? সুশীলা না হয় ডাক্তারী শিখে এসে দেশের কাজ কর্‌বে। আমি কি শিখব। সিগারেট আর লজেঞ্জ বেচবার যে বিদ্যা, তা আমার আছে। কিন্তু, ও কাজও আমি ছেড়ে দেব। আপনারাও চলে যাবেন, আমিও দোকান-পাট তুলে দিয়ে কি করব জানেন? হরিদ্বারের ঐ আশ্রমে গিয়ে, মা সুশীলা যে কুটীরে ছিল, সেই কুটীর দখল ক'রে বস্‌ব। ও যেখানে বস্‌ত, সেইখানে ব'সে থাক্‌ব। আর আমার স্থান নেই। আশ্রমের সেই কুটীরের সুমুখের গাছতলায় বসে ওরই নাম জপ কর্‌ব। ডাক্তারসাহেব, ও কি সুধ্‌ সুশীলা? ও আমার মা—আমার জগন্মাতা। ও যেখানে থাকুক না কেন,

আমি ওকে দেখ্‌তে পাব। যাক্ না বেটী দ্বীপান্তরে। তাতে কি আর মনান্তর হ'বে। এই আমার কথা। এতক্ষণ পাগলের মত যা মুখে এল, তাই বল্‌লাম। এইবার আসল কথা বলে ফেলেচি। আপনারা এখন যত শীগ্‌গির পারেন, যাওয়ার বন্দোবস্ত করুন। আপনাদের বিদায় না করে দিদিও নড়বেন না, আমিও যাব না; এই রাণীমার অন্ন ধ্বংস করব।

রাণী বলল, আমার অন্ন তো ধ্বংস হ'বে না; মায় সুদ জমা হ'বে। একবার কলকাতায় গিয়ে সুদে-আসলে আদায় ক'রে আস্‌ব।

ডাক্তারসাহেব বললেন, কবে যে যাত্রা করতে পারব, তা ঠিক বলতে পারছি নে। আর যে এ দেশে আসতে পারব, তা মনে হয় না। এবার যখন এসেছি, তখন বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে শেষ দেখা করে যেতে চাই। একবার সিমলায় যেতে হ'বে। লাহোরেও যেতে হ'বে; কলিকাতায় একবার না গেলেই চলবে না। তারপর জিনিসপত্র গোছাতে হ'বে। বিলাতের কথা ভাবি নে, এই মেলেই আমি চিঠি লিখে দিলেই সব ঠিক হ'য়ে যাবে। সেখানে গিয়ে যাকে সুশীলার শিক্ষয়িত্রী ও সঙ্গিনী ক'রে দেব, তাও মনে মনে ঠিক করছি। এই মেলেই তাকে পত্র দেব। সে প্রায় ত্রিশ বছর কলকাতায় ছিল। বাঙ্গলা যা জানে, সুশীলাও তত জানে না। সে এ দেশে জেনানা-মিশনে ছিল। সব দিক দিয়েই সে উপযুক্ত। সুশীলার কোন কষ্ট হ'বে না। আমি মনে করছি, কালই আমি বেরিয়ে পড়ি। দশ বারো দিনের মধ্যেই ফিরে আস্‌তে পারব। এক সিমলাতেই দু'তিন দিন বিলম্ব হ'তে পারে।

আমি সেখান থেকেই 'প্যাসেজ এন্‌গেজ' কর্‌ব। তারপর ফিরে এসেই বরাবর বোম্বে গিয়ে জাহাজ ধরব। হরেন্দ্র, আমি যখন তোমাকে পত্র দেব, তখন তুমি রাণীকে সঙ্গে নিয়ে বিলাতে যাবে। তোমাকে সেখানে অনেক দিন থাকতে হ'বে না, এখানকার এমন বাঁধা প্র্যাক্‌টিস্‌ ছেড়ে অনেকদিন বাইরে থাকাও ঠিক হ'বে না। সুশীলার শিক্ষা যখন শেষ হ'য়েছে মনে করব, তখনই তোমরা যেও। তারপর সবাই এক সঙ্গে এস। তবে' ততদিন আমি বাঁচব কি না বল্‌তে পারি নে। যদি বেঁচে থাকি, তা হ'লে আমিও তোমাদের সঙ্গে এসে সুশীলার কার্য্যক্ষেত্র ঠিক ক'রে দিয়ে যাব। চাই কি, জীবনের অবশিষ্ট কয়টা দিন এ দেশেই কাটিয়ে দেব। এবারও আস্‌বার সময় ঐ কথাই ভেবেছিলাম; কিন্তু, কার্য্যতঃ তা হ'য়ে উঠ্‌ল না। বাঁচি আর মরি, আমি যা করবার, তার ব্যবস্থা বিলাতে গিয়েই করব, বিলম্ব করব না। যে উইলখানা করেছিলাম, তা একেবারে রদ করে, আর একখানা নূতন উইল করতে হ'বে। আমি আর একটা ডুপ্লিকেট রেজেষ্টি ক'রে তোমাকে পাঠাব হরেন্দ্র। আমি সেবার যখন ছুটি নিয়ে বিলাত যাই, তখন সতীশের উপর কোন ভারই দিই নি, কারণ আমি বেশ জান্‌তে পেরেছিলাম, পৃথিবীতে তার কাজ শেষ হ'তে বিলম্ব নেই। এবার তোমার ও তিনকড়ির ওপরই এ দেশের কাজের সম্বন্ধে আমি বেশী নির্ভর করব। তিনকড়ি যা এতক্ষণ বল্‌ল, সে সব বাজে কথা। ও শীঘ্র অব্যাহতি পাচ্ছে না। তবে, সবই ভগবানের হাত হরেন্দ্রনাথ!



ভের

পরের দিনই ডাক্তারসাহেব সিমলা চলে গেলেন। যাবার সময় বলে গেলেন, তিনি সিমলা থেকে লাহোরে যাবেন, সেখান থেকে সোজা কলকাতায় যাবেন, পথে একবেলার জন্য এলাহাবাদেও নামতে পারেন। সুশীলাদিদির জন্য কি কি দরকার হ'বে, তার দুইটা ফর্দ্দ করলেন; একটা তিনি নিলেন, কল্‌কাতা থেকে সেগুলি কিনে আন্‌বেন; আর একটা ফর্দ্দ আমাকে দিয়ে বললেন, হরেন্দ্র, এ সব তুমি গুছিয়ে রেখ। আমি এসে যেন সমস্ত রেডি পাই—এই বলেই তিনি কয়েকখানি নোট আমাকে দিতে এলেন।

আমি বললাম, আপনার আশীর্ব্বাদে এই সামান্য কয়টা টাকা আমি দিদির জন্য খরচ কর্‌তে পারব।

তিনকড়ি বলল, সাহেব, আমার স্কন্ধে যে পাঁচ হাজার টাকা চাপিয়ে রেখেছেন, তার কি হ'বে? আমি আজই একবার কলকাতায় যাব। হঠাৎ চলে এসেছি, কাজ-কর্ম্মের কোন ব্যবস্থাই করে আসি নি। সেগুলো ঠিক করে চারপাঁচ দিনের মধ্যেই আমি এখানে আসব। আপনি অনুমতি করুন আর নাই করুন, আমি ব্যাঙ্ক থেকে সব টাকা তুলে নিয়ে আসব, তারপর যা করতে হয় আপনি করবেন।

ডাক্তারসাহেব বললেন, না তিনকড়ি, টাকা তুলে আন্‌বার দরকার নেই। টাকা তো তোমায় দিই নি, সুশীলার জন্য খরচ

করবার অধিকারই তোমাকে দিয়েছি। সে খরচের যখন আপাততঃ দরকার হচ্চে না, তখন থাক না টাকাটা ব্যাঙ্কে মজুদ। তাতে তোমার কি ভার বোধ হচ্চে। এখন থাক; পরে যা হয় দেখা যাবে।

তিনকড়ি বলল, বেশ, তাই হ'বে।

ডাক্তারসাহেব প্রাতঃকালের গাড়ীতে সিমলায় চলে গেলেন; তিনকড়ি রাত্রের গাড়ীতেই কলকাতায় যাত্রা করল। বড়মাসীমা কানপুরেই থাকলেন; সুশীলা-দিদিকে যাত্রা করিয়ে দিয়ে তারপর যা হয় করবেন। আত্মানন্দস্বামীও সেই দিন হরিদ্বারে চলে গেলেন; বলে গেলেন, সুশীলারা যেদিন কানপুরে থেকে যাত্রা করবে, দিন দুই আগে সে সংবাদ পেলে তিনি স্বামীজির অনুমতি নিয়ে একবার তাকে শেষ দেখ্‌তে আসবেন, হয় তো সুবিধা হ'লে বোম্বাই পর্য্যন্তও যেতে পারেন। আমি আর রাণী ভবশঙ্করকে নিয়ে যে বোম্বাই পর্য্যন্ত যাব, সে আমরা ঠিক ক'রেই রেখেছিলাম।

আমি মনে করেছিলাম, বিলাত যাওয়ার এই ব্যবস্থায় সুশীলা-দিদি হয় তো বিমর্ষ হ'বেন। তার কোন লক্ষণই দেখলাম না। তিনি তেমনই হেসে খেলে গৃহস্থালীর কাজ করতে লাগলেন, আর দণ্ডে দশবার শঙ্করকে কোলে নিয়ে কি আনন্দ!

মাসীমা একদিন বললেন, ওরে সুশীলা, ছেলেটাকে যে এমন ক'রে গলার হার করলি, আর ক'দিন পরেই যখন ছেড়ে যেতে হ'বে, তখন কি করবি। কেঁদে মরবি যে!

সুশীলা-দিদি বললেন, কেন, ওকে আমি সঙ্গে নিয়ে যাব।

সেখানে ওকে লেখাপড়া শেখাব। তারপর ও হাকিম হ'য়ে আসবে। এখানে থাক্‌লে তো শিখবে 'রাম রাম, বাবুসাহেব!' বড় জোর না হয় কাপড়ের কলের কেরাণী হ'বে, আর না হয় বটতলার উকিল হ'বে। খুব যদি সৌভাগ্য হয়, তা হ'লে দীনবন্ধু মিত্রের ঘটীরাম ডিপুটী হ'বে। ওকে আমি সাহেব করব।

আমি হেসে বললাম, মানুষ খুন-করা হকিমের ছেলের অত আশা করতে নেই। আগে দেখি, ওর মাসীমা কেমন মেমসাহেব হ'য়ে আসেন, তারপর বোন-পো'র কি করা যাবে, তা ঠিক হ'বে।

সুশীলা-দিদি বললেন, মেমসাহেব! সে আমি কখ্‌খনোই হ'ব না। এই যে শাড়ী দেখছেন জামাইবাবু, এ আমি ছাড়ব না কোন দিন। এখন যেমন বাঙ্গালী আছি, তার থেকে বেশী বাঙ্গালী হ'ব। বিলাতে খুব শীত বল্‌ছেন? সে শীত আমি মোটা কাপড়েই সইতে পারব। এই যে দু' বছর হরিদ্বারে ছিলাম, কই, শীতকালেও আমার শীত বোধ হয় নি। সেখানে না হয় এর চারগুণ শীত হ'বে; আমি কম্বল গায়ে জড়িয়েই চালিয়ে নিতে পারব।

আমি বল্‌লাম, বাইরে বেরুবার সময় গরম জামা, গরম মোজা ব্যবহার করতেই হ'বে, নইলে একদিনেই নিউমোনিয়া। তখন ডাক্তারসাহেবের বাবারও সাধ্য হ'বে না যে রক্ষা করেন।

সুশীলা-দিদি বল্‌লেন, তিনি রক্ষা না করলেই আমি রক্ষা পাই। এখানেও গঙ্গা, সেখানেও গঙ্গা! এখানে না হয় নাম হয়েছে ভাগীরথী; সেখানে নাম হ'য়েছে তমসা। ও একই কথা। সেখানে মরতে আমার কোন আপত্তি নেই। ও—খাবার কথা

বল্‌ছেন' আপনি। আপনি মনে ক'রেছেন, বিলাত গিয়ে আমি রুটি, বিস্কুট, মুরগী, গোরু, শুয়ার, ঘোড়া খাব। সে হ'বে না বন্ধু! সেই হরিদ্বারে গিয়ে যে অন্নত্যাগ করেছি, ফলমূল ধরেছি, জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত তাই আমার থাক্‌বে। যদি এ দেশে থাক্‌তাম, তা হ'লেও ঐ আমার আহার হ'তো, বিলাতে এমন কি স্বর্গে গেলেও তাই আমার আহার হ'বে! এই তো এখানে কয়দিন এসেছি; মাসীমা, কাকীমা, কত বলেছেন। আমি তাঁদের আদেশ অমান্য করেছি। হরিদ্বারে আচার্য্য অচলানন্দের পায়ের তলায় বসে আর কিছুই শিখ্‌তে পারি নি, শিখেছি আত্মসংযম। এই বর্ম্মে আবৃত হ'য়েই আমি নিরাপদে আমার জীবন কাটাতে পারব, কোন প্রলোভন আমাকে পথভ্রষ্ট করতে পারবে না।

রাণী বল্‌ল, আচ্ছা দিদি, তুমি যখন এম-ডি ডাক্তার হ'য়ে আস্‌বে, তখন তোমার নাম কি হ'বে?

সুশীলা-দিদি বল্‌লেন, তুই বল্‌ না কি নাম হ'বে।

রাণী বল্‌ল, তোমার নাম হ'বে ডক্টর মিসেস সুশীলা মিত্র এম-ডি।

সুশীলা-দিদি বল্‌লেন, কিছুতেই না। ও সব 'ডক্টর' 'এম-ডি কিছুই আমার নামে থাক্‌বে না। আমার নাম এখনও যা, লাট-সাহেব হ'লেও তাই থাক্‌বে—আমার নাম সুশীলা চট্টোপাধ্যায়।

আমি বল্‌লাম, সে কি রকম; আপনি তো দিদি কায়স্থের মেয়ে, কায়স্থের স্ত্রী। আপনার নামের সঙ্গে আমাদের, ব্রাহ্মণের চট্টোপাধ্যায় কেন?

সুশীলা-দিদি বল্‌লেন, আমি কায়স্থের মেয়ে নই। যেদিন কলকাতার কম্বুলেটোলা থেকে বে'র হ'য়েছিলাম, সেই দিন থেকে আমার জাত গিয়েছিল। আমার মা কি বলেছিলেন মনে নেই। তিনি বলেছিলেন 'আমার কোন মেয়ে হয় নি, সুশীলা নামে আমার কেউ নেই।' সে কথা, সে সতীলক্ষ্মীর কথা কি আমি ভুলেছি? সেইদিন থেকে আমি কায়স্থের মেয়ে নই। তার পর যে-দিন মৃতপ্রায় অবস্থায় আমি সাজাহানপুরে গিয়েছিলাম, সেদিন কেউ আমাকে আহ্বান করে নি. ঐ আমার স্বর্গীয় কাকাবাবু সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আমাকে কোলে তুলে নিয়েছিলেন; বলেছিলেন, তোর আর কেউ না থাকে আমি আছি। সে কথা আমি ভুলি নি রাণী! সেইদিন থেকে আমি চট্টোপাধ্যায়—আমি সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মেয়ে। তারপর, আর একটা কথা আছে রাণী! তোর ঐ মিসেস্ কথাটায় আমার ঘোর আপত্তি। আমি কুমারী ব'লে নিজের পরিচয় দিতে পারব না; কিন্তু আমি যে বিধবা, এ কথাও আমি কোন দিন স্বীকার করব না। আমি যে বিবাহিতা, তাও আমি স্বীকার করব না। আমি ও-সব কিছুই নই। আমার অন্য কোন পরিচয় নেই। আমার পিতৃকুল নেই, মাতৃকুল নেই, শ্বশুর কুলও মোটেই নেই। আমার জীবন আরম্ভ হ'য়েছে সাজাহানপুরে; আমার নাম তাই সুশীলা চট্টোপাধ্যায়, আর কিছু নয়।

এই অপূর্ব্ব কথা শুনে আমার শাশুড়ী উঠে এসে সুশীলা-দিদিকে বুকে জড়িয়ে ধরে বল্‌লেন, সেই ঠিক মা, তোর কথাই ঠিক। তুই আমার বড় মেয়ে, রাণী আমার ছোট মেয়ে। তোর

মত মেয়ে পেয়ে আমি ধন্য। আর যিনি স্বর্গে ব'সে তোর এই অমৃতময়ী কথা শুনছেন তাঁর প্রাণ জুড়িয়ে যাচ্ছে মা আমার!

* * * *

তের দিন পরে ডাক্তারসাহেব কানপুরে ফিরে এলেন; বল্লেন, তিন দিন পরে বোম্বে থেকে যে জাহাজ ছাড়বে, তাইতে তাঁদের প্যাসেজ বুক হ'য়েছে। ইতিমধ্যে তিনকড়িও এসে গিয়েছে।

যে-দিন ডাক্তারসাহেব এলেন, সেইদিনই রাত্রির মেলে যাত্রা না করলে তৃতীয় দিন প্রাতঃকালে বম্বেতে জাহাজ ধরতে পারা যাবে না।

তখন তাড়াতাড়ি যাত্রার আয়োজন করা হ'ল। ডাক্তার সাহেব আমার উপর যে সকল জিনিস কেনবার ভার দিয়েছিলেন, আমি সে সব কিনে রেখেছিলাম। তিনি কলকাতায় যা কিছু কিনেছিলেন, সে সব সেখান থেকেই বম্বে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

আমি, রাণী, ভবশঙ্কর আর তিনকড়ি বম্বে পর্য্যন্ত যাব স্থির হলো। আত্মানন্দকে তার করে দিলাম; তাঁর আর আসবার সময় হলো না। বিকেল বেলাতেই স্বামী অচলানন্দের তার পেলাম; তিনি সুশীলা-দিদিকে সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ করেছেন।

সুশীলা-দিদি সকলের পায়ের ধূলা নিয়ে যাত্রা করলেন। তৃতীয় দিন প্রাতঃকালে বম্বে পৌঁছেই আমরা ডাক্তারসাহেব ও সুশীলা-দিদিকে জাহাজে তুলে দিলাম। বেলা সাড়ে আটটার সময় জাহাজ বম্বে ত্যাগ করল। রাণী চোখের জল ফেলতে লাগল, শঙ্কর মাসীমার নাম ধ'রে চীৎকার করতে লাগল। আর তিনকড়ি স্থির নেত্রে সমুদ্রবক্ষের জাহাজের দিকে চেয়ে রইল।



চোদ্দ

আমি মনে করেছিলাম বম্বেতে সমুদ্রের জলে সুশীলা-দিদিকে ভাসিয়ে দেবার পর আমার আর কিছু বল্‌বার আবশ্যক হবেনা, সুশীলা-দিদির জীবনের অবশিষ্ট কথা তাঁরাই কেউ বল্‌বেন। কিন্তু ভগবান্ আমারই উপর শেষ কথা লিখবার ভার দিয়েছেন; সুতরাং অবশিষ্ট কথা আমাকেই বল্‌তে হচ্ছে।

তবে, আমার একটা সুবিধা হয়েছে; আমি নিজে একটি কথাও বল্‌ব না, বল্‌বার আবশ্যক হবে না। সুশীলা-দিদি চ'লে যাবার পর এতদিনের মধ্যে ডাক্তারসাহেব আমাকে যে সকল পত্র লিখেছিলেন, সুশীলা-দিদি রাণীকে যে সকল পত্র দিয়েছিলেন, সে সমস্তই আমি সযত্নে রেখে দিয়েছিলাম। আর সুশীলা দিদি তিনকড়িকে কয়েকখানি চিঠি লিখেছিলেন, তিনকড়ি সেগুলিও আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। সেই সকল চিঠির কয়েকখানি প্রকাশ করলেই আমার কর্ত্তব্য শেষ হ'বে। ডাক্তারসাহেব আমাকে ইংরাজী ভাষাতেই পত্র লিখেছিলেন, সেগুলির বাঙ্গলা অনুবাদ আমিই করেছি। সুশীলা-দিদির সব চিঠিই বাঙ্গলা ভাষায় লিখিত। এখন সেই চিঠিগুলিই আমি যথাযথ উদ্ধৃত ক'রে আমার কঠোর কর্ত্তব্য শেষ করি।

প্রথম পত্র

এডেন—সোমবার

প্রিয় হরেন্দ্রনাথ,

তোমাকে আর 'ডাক্তার মুখার্জ্জি' বলে সম্বোধন করতে পারছিনে। তুমি পরলোকগত সতীশের জামাই ; সুতরাং আমারও জামাই। তোমাকে আমি আমার পুত্রের মতই মনে করি।

আমরা আজ এডেনে পৌঁছে গিয়েছি। আমার ভয় হয়েছিল, সমুদ্রে জাহাজের দোলাতে সুশীলা অসুস্থ হ'য়ে পড়বে। যারা কখন সমুদ্রে জাহাজে চড়ে নাই, তাহাদের প্রায় সকলেরই সমুদ্র-পীড়া (Sea sickness) হ'য়ে থাকে। সুশীলার সমুদ্র-পীড়া দূরে থাকুক, সামান্য একটু অসুস্থ বোধও সে এ কয়দিন করে নাই। তোমাদের ছেড়ে এসে আমার মন কাতর হ'য়েছে, কতবার তোমাদের কথা মনে হ'য়েছে। কিন্তু, কি আশ্চর্য্য, সুশীলার একটুও ভাবান্তর হয় নাই ; সে যেন অধিকতর প্রফুল্ল হয়েছে, তার মনে যেন কোন চিন্তার উদয় হয় নাই, কারও কথা যে সে ভাবে, তার মুখ দেখে তা মোটেই মনে হয় না। আমার এই সুদীর্ঘ জীবনে আমি অনেক নর-নারীর সংশ্রবে এসেছি ; ভারতবর্ষেও অনেককে দেখেছি ; ইউরোপেও অনেককে দেখেছি ; কিন্তু সুশীলার মত মেয়ে আমি কখনও দেখি নাই :—সে একেবারে সুখদুঃখের অতীত স্থানে চলে গিয়েছে ; তোমরা যে ছয়টী রিপুর কথা ব'লে থাক, সুশীলা সে ছয়টাকেই বশীভূত করেছে। তারপর তোমাদের শাস্ত্রে যে বলে 'শীতাতপদ্বন্দ্বসহিষ্ণু' সুশীলা তাই

হ'য়েছে। সুতরাং, বিগত দুই বৎসরে স্বামী অচলানন্দজি সুশীলাকে একেবারে দেবী তৈরী করে দিয়েছেন; তার হরিদ্বারের আশ্রমে বাস বিফল হয় নাই—সর্ব্বাংশে সফল হ'য়েছে।

আর একটা কথা বলি। এমন অসাধারণ মেধা আমি কোন স্ত্রী-পুরুষে দেখি নাই। মেয়েটা, যাকে তোমরা শ্রুতিধর বল, তাই। এই সামান্য কয়টা দিনে সে ইংরাজী ভাষা এমন শিখে ফেলেছে যে, আমি অবাক্ হ'য়ে গিয়েছি। যে কথাটী যেমন ক'রে বলেছি, ঠিক তেমনই ক'রে সে কথা সে আয়ত্ত করে নিয়েছে। পড়াশুনার জন্য তো এ কয়দিন সে বেশী সময় ব্যয় করে নাই। প্রাতঃকালে উঠে সেই যে ডেকে গিয়ে চেয়ার টেনে নিয়ে ব'সে সমুদ্র আর আকাশের দিকে চেয়ে থাকে, সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। সে যেন তন্ময় হ'য়ে যায়। আমি তার এই ধ্যান ভঙ্গ করিনে। দশটার পর সে স্নান করে। তারপর আমার কাছে ব'সে ইংরাজী পড়ে। তার পড়ার সঙ্গে আমি দৌড়ে পেরে উঠিনে। চারটে বাজলেই সে পড়া ছেড়ে ওঠে; তখন আর তাকে ক্যাবিনের মধ্যে আট্‌কে রাখ্‌তে পারিনে—সমুদ্র আর আকাশ যেন তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। সে তখন অধীর আগ্রহে ডেকের দিকে ছুটে যায়। তারপর সেই অপার জলনিধি আর অসীম আকাশ তাকে গ্রাস ক'রে ফেলে। এ মেয়েকে কি বল্‌ব হরেন্দ্র!

সারাদিন সে কিছু খায় না—জলবিন্দুও না। সন্ধ্যার পর ক্যাবিনের মধ্যে একবার এসে সামান্য ফলটল খায়; তারপরই

আবার ছুটে যায় সেই নক্ষত্র-খচিত আকাশ আর নীলাম্বুর কাছে।

এ কয়দিন এই ভাবেই কেটেছে। সুশীলার জন্য আমার যে ভয় ছিল, তা আর নেই। তাকে দেখলে মনে হয় তার যেন সংসারে কোন বন্ধন নেই। এর পরে তার ভাবের কি পরিবর্ত্তন হয়, তা পরে জানাব।

তোমাদের কুশল সংবাদ যেন সর্ব্বদা পাই। পথের মধ্যে আর কোন্ স্থান থেকে পত্র লিখবার সুবিধা করতে পারব, তা ঠিক বলতে পারছিনে। তবে, এ কথা ঠিক জেনে রাখ যে, সুশীলা অসুস্থ হ'লে তখনই তোমাদের জানাব। ডাকের সময় হয়েছে; আজ এইখানেই ইতি।

তোমাদের চিরবন্ধু—গ্রেহাম

দ্বিতীয় পত্র

আমার স্নেহের রাণী,

'জয় বাবা বিশ্বনাথজীকী জয়'—এতদিন পরে কা'ল ডাঙ্গায় নেমেছি। একেবারে খাঁটি বিলেত।

জাহাজ থেকে আর কাউকে পত্র লিখতে পারি নি। একেবারে সময় পাই নি। দিনরাত শুধু সমুদ্র আর আকাশ আমাকে একেবারে পেয়ে বসেছিল। তারা কিছুতেই আমার সঙ্গ ছাড়তে চায় নি! তাদের সঙ্গে গল্প করেই শেষ করতে পারিনে, তার পত্র লিখব কখন। সেই জন্যই আমি তোমাদের কাছে কোন সংবাদ পাঠাইনি। সে অভাব ডাক্তারসাহেব যোল

আনা পূরণ করেছেন। যেখানে জাহাজ থেমেছে, সেইখানেই ঐ বুড়া মানুষ ছুটে নেমে গিয়েছেন তোমাদের কাছে তার পাঠাবার জন্য। আমি কোন দিন কোথাও তীরে নামিনি। ডেক চেয়ারখানির সঙ্গে আমি অতি মধুর সম্বন্ধ পাতিয়েছিলাম, তাকে ছেড়ে থাক্‌তে পারতাম না।

দেখ রাণী, যে কয়দিন জাহাজে ছিলাম, সেই কয়দিনে ইংরাজী খুব পড়েছি, অর্থাৎ রোজ গড়ে এই ঘণ্টা তিনেক। সেও কর্ত্তব্যের খাতিরে, প্রাণের আগ্রহে নয়! ডাক্তারসাহেব শুধু চিকিৎসকই নন, জ্যোতিষীই নন, তিনি পাকা মাষ্টার মশাই। এই তো ক'টামাত্র দিন, এরই মধ্যে আমি যা হোক এক রকম ইংরাজী বল্‌তে শিখেছি; অক্ষর-পরিচয় তো আগেই ছিল।

এইবার বিলেতের কথা বলি। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল এক কথাতেই বিলেতের সব পরিচয় দিয়ে গিয়েছেন—এই বিলেত দেশটা মাটির! এর পরে আর কথা নেই। সবে কা'ল এসেছি; এখনও ঘরের বা'র হইনি। দিনকয়েক শুয়ে ব'সে বিশ্রাম করে নিই, তারপর বেড়ানো যাবে। তখন বিলেতের কথা বল্‌ব।

আমরা যে বাড়ীতে আছি, সেটা সহরের বাইরে। কোন গোলমাল নেই। ছোটখাটো বাড়ী, আর তার চা'রদিকে বাগান। বাড়ীখানি আমার বড়ই ভাল লেগেছে; যেন পটে আঁকা। এখানি ডাক্তার সাহেবের নিজের বাড়ী।

এই বাড়ীতে কা'ল বিকেলে এসে যখন উঠ্‌লাম তখন আমাদের অভ্যর্থনা কর্‌লেন কে, তা জান রাণী! তাঁর নাম মিস্

বারক্র—আমার শিক্ষয়িত্রী। তিনি কা'লই সকালবেলায় এসে আমাদের প্রতীক্ষা কর্‌ছিলেন। অতি ভাল মানুষ, একেবারে বাঙ্গালী মেয়ে বল্‌লেই হয়। অনেকদিন বাঙ্গলা দেশে মেয়ে-মিশনে ছিলেন; আমাদের দেশের সব জানেন। তাঁকে পেয়ে আমার খুব আনন্দ হ'য়েছে। তিনি আমাকে 'আজ ছুটী দিয়েছেন, কাল থেকে পড়া আরম্ভ করবেন। আজ তাই তোমাদের কাছে পত্র লিখ্‌বার সময় পেলাম। কা'ল থেকে সুধু পড়া, আর পড়া। আমি ঠিক করেছি, লেখাপড়া ছেড়ে টো-টো ক'রে বেড়াব না; তাতে পড়ার ক্ষতি হ'বে। বিলেত তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না। যার জন্ম এসেছি, তা শেষ হ'য়ে গেলে, তখন সুধু বেড়াও, আর বেড়াও। সুতরাং, এর পর থেকে আর বড় পত্র লেখার উপকরণ কোথায় পাব। আমরা ভাল আছি; তোমরা কেমন আছ, আমার ভবশঙ্কর কেমন আছে—ব্যস্‌। এটুকু আমি প্রতি সপ্তাহেই লিখ্‌তে পারব। তুমি কিন্তু তাই ব'লে পোষ্ট কার্ডে চিঠি লিখো না—তোমার কাছ থেকে পোষ্ট কার্ড এলে, তা নেবই না; লিখে দেব Refused, 'রিফিউসড্‌' (ফেরৎ) বুঝলে।

আজ আর বেশী লিখ্‌ব না। কাকীমাকে আমার প্রণাম জানাইও; জামাইবাবুকে আমার সেলাম; তুমি আমার আশীর্ব্বাদ নিও; আর শ্রীমান্‌ ভবশঙ্করকে আমার পক্ষ থেকে দশটা চুমু দিও, আর বোলো, তার মাসীমা মেমসাহেব হ'য়েছে।

আশীর্ব্বাদিকা—সুশীলা চট্টোপাধ্যায়

তৃতীয় পত্র

তিনকড়ি মামা,

কা'ল বিলেতে পৌঁছেছি। পথে কোন কষ্টও হয় নি, অসুবিধাও হয় নি। শুনেছিলাম, জাহাজে সমুদ্র-পীড়া হয়; আমার কিছু হয় নি, একটু মাথাঘোরাও টের পাই নি। সমুদ্র আর আকাশ যে এত সুন্দর, তা আমি জানতাম না।

কা'ল সবে এসেছি, বিলেতের কিছুই দেখি নি; তার আর কি খবর তোমাকে দেব। তুমিও তা শুনবার জন্য ব্যস্ত হও নি।

এখানে আসা যে তোমার মত ছিল না, তা তুমি মুখ ফুটে না বল্‌লেও আমি বুঝতে পেরেছিলাম। তুমি আমাকে নির্ব্বাসন দণ্ডই দিয়েছ। কিন্তু, আমাকে কি তুমি তোমার মন থেকে বা'র করে দিতে পেরেছ? কিছুতেই না, তিনকড়ি মামা, কিছুতেই না। আমি তোমার শনি হ'য়ে এসেছিলাম। তুমি যে তোমার এই পাগলী মেয়েকে কত ভালবাস, তা আমি জানি। তুমি আমাকে যে পথ দেখিয়েছিলে, সে পথ যে আমার নয়, তা তুমি বুঝেও বুঝতে চাও নি। দেখ মামা, আমি একটা কথা বলি। ঘর-সংসার করা বিধাতা আমার অদৃষ্টে লেখেন নাই, তোমার অদৃষ্টেও না। কিন্তু, তুমি একটা ভুল করেছ। তুমি মনে করেছ, আমার এই সব দুর্গতি, এই সব কষ্ট-যন্ত্রণার কারণ তুমি। তাই তুমি আমার জন্য অত কাতর হ'য়েছিলে; এখনও তোমার সে ভ্রম দূর হয় নি। আমি তোমাকে বল্‌ছি তিনকড়ি মামা, তোমার কোন অপরাধ নেই। আমি যা কিছু

করেছি, তার জন্য তুমি একটুও দায়ী নও। কম্বুলেটোলার আড্ডা আমাকে প্রলুব্ধ করতে পারে নাই। আমি ক্ষণেকের জন্য আত্মবিস্মৃত হ'য়েছিলাম; কিন্তু, তা সামলে নিয়েছিলাম। এর মধ্যে তোমার অপরাধ কোথায়? কিন্তু, তুমি এতদিনেও তা বুঝলে না; যে অপরাধ তুমি কর নাই, সেই কল্পিত অপরাধের জন্য তুমি কি কঠোর প্রায়শ্চিত্ত করছ। আগেই বলেছি, তোমাকে সংসারী হ'তে বল্‌ছিনে; সে পথ তোমার নয়; কিন্তু, তাই ব'লে তোমাকে সন্ন্যাসী হ'তেও বলব না। আমি যে উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে এসেছি, তা সফল করবে তুমি—তুমি তিনকড়ি মামা, একমাত্র তুমি। তোমার ত্যাগের কথা, তোমার অতুলনীয় স্নেহের কথা মনে করে আমি দ্বিগুণ উৎসাহে এখানে কাজ করব। তার পর দেশে ফিরে যাওয়া যদি ভগবানের বিধান হয়, তা হ'লে সেখানেও তুমিই আমার দক্ষিণ হস্ত হ'বে। এই কথাটা কোনদিন তুমি ভুলো না। এই আমার অনুরোধ,এই আমার প্রার্থনা।

আমি যে সর্ব্বদা তোমাদের কাছে চিঠি লিখ্‌তে পারব, তা আমার মনে হয় না। আমি চিকিৎসা-শাস্ত্র পড়বার জন্য আমার প্রাণ মন সমর্পণ করব; অন্য কোন চিন্তা, কারও কথা আমি এখন ভাবব না। আমার সংবাদ তোমরা ডাক্তারসাহেবের কাছ থেকেই পাবে।

মাসীমাকে আমার শতসহস্র প্রণাম দিও। তিনি যেন প্রতিদিন এই অভাগীকে আশীর্ব্বাদ করেন।

তোমার স্নেহের—সুশীলা

চতুর্থ পত্র

প্রিয় হরেন্দ্রনাথ,

সুশীলাকে এই সোমবারে লণ্ডনের ডাক্তারী কলেজে ভর্ত্তি করে দিয়ে এসেছি। কলেজের অধ্যক্ষ ও দুই-চারজন অধ্যাপক তো বিশ্বাসই করতে চান না যে, এই সামান্য সাত মাসে সুশীলা এ-বি-সি থেকে আরম্ভ করে এত বেশী শিক্ষালাভ করেছে। তাঁরা বল্‌লেন, সাত মাস কেন, সাত বছরেও কেউ এত শিখ্‌তে পারে না। সুধু কি ইংরাজী ভাষা, এই সাত মাসে সুশীলা চিকিৎসা-শাস্ত্র-সম্বন্ধে অনেক বই পড়ে ফেলেছে, এ কথা তোমাকে পূর্ব্বের চার পাঁচখানা পত্রেই জানিয়েছি। কি আশ্চর্য্য মেয়ে এই সুশীলা! কি অদ্ভুত তার মেধা! কি অবিচলিত তার অধ্যবসায়! বল্‌তে গেলে, এই সাত মাসে সে অসাধ্য সাধন করেছে। এ সব কথা প্রতি পত্রেই তোমাকে, রাণীকে, তিনকড়িকে লিখেছি। তবুও বারবার সুশীলার পড়াশুনার অপূর্ব্ব-উন্নতি, তার জ্ঞানলাভের একাগ্রতার কথা বল্‌তে ইচ্ছা করে; বারবার ব'লেও আমার তৃপ্তি বোধ হয় না।

দেখ হরেন্দ্রনাথ, আমি পূর্ব্বের উইল রদ করে নূতন উইল করেছি। তাতে আমার পেন্সনের টাকা আর আমার এই ছোট বাড়ীটা ব্যতীত আর যা কিছু আছে, সমস্ত সুশীলার নামে লিখে দিয়েছি। তার এখানকার পড়াশুনা শেষ হ'লে যখন সে বাঙ্গলা দেশে ফিরে যাবে, তখনও যদি আমি বেঁচে থাকি, তা হ'লে তার সঙ্গে আমিও তোমাদের দেশে যাব।

সেখানে গিয়ে সুশীলা যা করতে বলবে, সেই রকম ব্যবস্থা ক'রে, জীবনান্ত পর্য্যন্ত তোমাদের দেশেই থাকব। সুশীলার এখানকার কাজ শেষ হ'বার অব্যবহিত পূর্ব্বেই তোমাকে সংবাদ দেব, তুমি তখন তোমার পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবে; তুমি, রাণী ও ভবশঙ্করকে নিয়ে এখানে আসবে। তারপর সবাই এক সঙ্গে ভারতবর্ষে যাব।

আর একটা কথা। আমি তিনকড়িকেও কিছু টাকা দিবার ব্যবস্থা করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তা হোলো না। বোধ হয় সুশীলা কোন রকমে আমার অভিপ্রায়ের কথা জানতে পেরে তিনকড়িকে সে কথা জানিয়েছিল। তিনকড়ি প্রকারান্তরে সেই কথার উল্লেখ ক'রে আমাকে যে ভয় দেখিয়েছিল, তাতে তার সম্বন্ধে কিছু ব্যবস্থা করতে সাহসী হই নাই; সে ব্যবস্থা সুশীলাই করবে ব'লে আমার স্থির ধারণা হ'য়েছে।

সুশীলাকে কলেজে রেখে এসে আমি একেবারে অধীর হ'য়ে পড়েছি। এই সুশীলা-শূন্য বাড়ীতে আমার কিছুতেই মন টিকছে না। যে দিকে চাই, সেই দিকেই সুশীলার স্মৃতি-বিজড়িত। আমি ঠিক করেছি, প্রতিদিন অপরাহ্নে লণ্ডনে গিয়ে তার সঙ্গে দুই-এক ঘণ্টা কাটিয়ে আসব, এমন মায়ার বন্ধনে এই বৃদ্ধকে সে ফেলেছে।

বেলা প্রায় শেষ হ'য়ে এলো। এখনই সুশীলাকে দেখ্‌বার জন্য আমি লণ্ডনে যাব। সেইজন্য এখানেই এই পত্র শেষ করলাম। পরের মেলে সুশীলার কলেজ-জীবন সম্বন্ধে তোমাকে জানাব।

তোমরা আমার ভালবাসা গ্রহণ করিও। মাষ্টার ভবশঙ্করকে আমার শত-শত আশীর্ব্বাদ। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, সে যেন সর্ব্বাংশে সতীশচন্দ্রের মত হয়। এর বেশী আশীর্ব্বাদের কথা আমি জানি নে।

তোমাদের
গ্রেহাম

এই সাত মাসে আমরা ডাক্তারসাহেব আর সুশীলার কাছ থেকে যত পত্র পেয়েছি, তিনকড়িও যে সব পত্র পেয়ে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে, তার সকলগুলি দিতে গেলে প্রকাণ্ড একখানি মহাভারত হয়। সে চেষ্টা না করে ডাক্তারসাহেবের শেষ টেলিগ্রামের অনুবাদ এবং তার পরবর্ত্তী পত্রখানি দিয়েই অভাগী সুশীলাদিদির জীবন-কথা শেষ করব। আমার পরম দুর্ভাগ্য যে, আমাকেই এ সব কথা লিখ্‌বার জন্য সুশীলাদিদি আমাকে বাঁচিয়ে রেখে নিজে অনন্তধামে চলে গেলেন। শেষ সময়ে একবার তাঁর মুখখানি দেখ্‌তে পেলাম না। এখন মনে হচ্চে রাণী ঠিক কথাই বলেছিল "এমনি মনে হচ্চে আমার, গেলে দেখা আর হ'বে না।"

তার সেই ভবিষ্যদ্‌বাণীই সফল হ'য়ে গেল; ডাক্তারসাহেবের গণনাই ফলে গেল।

টেলিগ্রামের অনুবাদ

সব শেষ। আজ প্রাতঃকালে মেয়েদের হাসপাতালে ডিউটি করবার সময় অকস্মাৎ হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হ'য়ে

সুশীলা অনন্তধামে চলে গেছে। পত্রে সব কথা জানাচ্ছি। তিনকড়িকে তোমরাই এ সংবাদ দিও, আমি পারব না।

স্নেহাম্

শেষ পত্র

হরেন্দ্রনাথ,

সকল আশা, সমস্ত বাসনা বাতাসে মিলিয়ে গেল। সুশীলা ফাঁকি দিয়ে চলে গেল।

কা'লও বিকেলে আমি সুশীলাকে প্রতিদিনের মত দেখ্‌তে গিয়েছিলাম। তার চেহারার কোন বৈলক্ষণ্য দেখ্‌তে পাই নি; অন্য দিনের চাইতে কা'ল যেন তাকে বেশী প্রফুল্ল দেখেছিলাম। আর আজ—কোথায় সুশীলা, কোথায় সে? হরেন্দ্রনাথ, আমি যে কি ব্যথা পেয়েছি, তা প্রকাশ করতে পারছিনে।

আজ প্রাতঃকালে ন'টার সময় বাড়ীতে কি যেন করছিলাম, এমন সময় একজন লোক তাড়াতাড়ি এসে আমাকে বল্‌ল যে, আমাকে এখনই লণ্ডনের মেডিকেল কলেজে যেতে হ'বে; কলেজের অধ্যক্ষ আমাকে ডেকেছেন। তাকে জিজ্ঞাসা করে কোন সন্ধানই পেলাম না।

কোন অশুভ কিছু ঘটেছে মনে করে আমি তখন যে অবস্থায় ছিলাম, সেই অবস্থাতেই উর্দ্ধশ্বাসে লণ্ডনের কলেজে গেলাম। দেখি, একটা বারান্দায় একদল ছাত্র-ছাত্রী ও শুশ্রূষাকারিণী বিষণ্ণ মুখে দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে আস্‌তে দেখেই একটী ছাত্রী আমাকে পাশের একটা ঘরে প্রবেশ করতে বল্‌ল। আমি

সেই ঘরের মধ্যে গিয়ে দেখি কলেজের অধ্যক্ষ ও অনেকগুলি অধ্যাপক ব'সে আছেন। আমাকে দেখেই সকলে উঠে দাঁড়ালেন। অধ্যক্ষ মহাশয় অগ্রসর হ'য়ে আমার হাত ধ'রে বল্লেন, ডাক্তার গ্রেহাম, একটা শোচনীয় সংবাদ শুনবার জন্য প্রস্তুত হোন। আপনার সুশীলা পরলোকগতা!

এই কথা শুনে আমার মাথা একেবারে ঘুরে গেল; আমি মাটীতে পড়ে যাবার মত হ'তেই অধ্যক্ষ মহাশয় আমাকে ধ'রে একখানি চেয়ারে বসিয়ে দিলেন।

একটু পরেই আমি সামলে নিতেই অধ্যক্ষ মহাশয় বল্লেন, একটা ওয়ার্ডে একটী রোগিনীর বিছানায় সুশীলা গিয়ে বসেছিল। তাকে দুই-একটা কথা জিজ্ঞাসা করবার পরই হঠাৎ বাঙ্গলা ভাষায় 'মা গো' ব'লে চীৎকার করেই অজ্ঞান হ'য়ে সেই রোগিনীর বিছানায় পড়ে গেল। তখনই সংবাদ পেয়ে সকলে ছুটে এলেন, আমিও সেখানে গেলাম। আমাদের চিকিৎসা-বিজ্ঞানে যা কিছু করতে বলে, তার কোনই ত্রুটী আমরা করি নি। কিন্তু আমার বন্ধু, কি বল্‌ব, কিছুতেই তার জ্ঞান ফিরল না। অভাগী সুশীলা! এত সামান্য দুই মাসের মধ্যেই এখানকার সকলের হৃদয় এই অসাধারণ বাঙ্গালী মেয়েটী দখল করে বসেছিল। এত শীঘ্র সব শেষ হ'বে বলেই বুঝি প্রভু তাকে এত গুণের আধার করেছিলেন। অভাগী সুশীলা! ডাক্তার গ্রেহাম, আমরা এমন শিক্ষার্থিনী কখনও পাই নাই, ভবিষ্যতে পাব ব'লেও মনে হয় না।

একজন অধ্যাপক তখন আমার হাত ধ'রে পাশের একটা

ঘরে নিয়ে গেলেন। দেখি, একখানি খাটিয়ার উপর শুভ্র শয্যায় আমার সুশীলা অন্তিম-শয্যায় শায়িতা। তার সর্ব্বশরীর ফুল দ্বারা আচ্ছাদিত। মুখে তার সেই হাসি তখনও লেগে আছে!

আমি একবার সেই অনিন্দ্যসুন্দর, পবিত্রতা মাখা মুখের দিকে চেয়ে দৌড়ে সে ঘর থেকে বে'র হ'য়ে এলাম। সে দৃশ্যের সম্মুখে আমি থাকতে পারলাম না।

তারপর আমারই অভিপ্রায় মত সুশীলার শবদেহ দাহ করবার ব্যবস্থা হোলো। কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক, ছাত্রছাত্রী, শুশ্রূষাকারিণী প্রায় সকলেই শবের অনুগমন করলেন। শব-দাহের-আগারে উপস্থিত হ'লে একজন ধর্ম্মযাজক পরলোকগতা সুশীলার জন্য করুণ-সুরে প্রার্থনা করলেন। তারপর সেই আগারের মধ্যে মৃতদেহ অদৃশ্য হ'য়ে গেল। আমরা বাইরে ব'সে রইলাম। ঘণ্টা দেড়েকেই সব শেষ—হরেন্দ্রনাথ, সব শেষ হ'য়ে গেল। আমার সুশীলার মরদেহের চিহ্নমাত্রও রইল না।

প্রিয় হরেন্দ্রনাথ, এরই জন্য কি তোমাদের স্নেহের কোল থেকে সুশীলাকে আমি টেনে এনেছিলাম। কানপুরে তোমাকে বলে-ছিলাম, সুশীলার একটা গ্রহ বিশেষ অপ্রসন্ন, কিন্তু এক বৎসর পূর্ণ না হ'তেই যে এমন হ'বে, তা আমি কোনদিন ভাবি নি। আমার আশা ছিল, এ গ্রহের দোষ খণ্ডন হ'বে। সে ভরসা তোমাদেরও দিয়েছিলাম। কিন্তু হায়! সব বৃথা হোলো। আমার একটা বাসনাও পূর্ণ হোলো না। বিধাতার অমোঘ বিধানে হরেন্দ্রনাথ, আর কি বল্‌ব।

এই একটু আগেই সব কাজ শেষ ক'রে ঘরে ফিরে এসেই তোমাকে পত্র লিখ্তে বসেছি; কলেজ থেকেই তোমাকে টেলিগ্রাম করেছিলাম।

পথে আস্তে আস্তেই আমার ভবিষ্যৎ কার্য্যপ্রণালী আমি স্থির করে ফেলেছি।

আমি আর এ-দেশে থাকব না হরেন্দ্রনাথ! আমি এখানে থাক্তে পারব না। তোমাদের কাছেও আমি যাব না। তোমাদের কাছে গিয়ে কি বল্ব! আমি কয়েক দিনের মধ্যেই এখানকার বাড়ী বেচে, অন্যান্য ব্যবস্থা করে অবশিষ্ট জীবন অষ্ট্রেলিয়ায় কাটাব স্থির করেছি। আমারও জীবন-কাল সংক্ষেপ হ'য়ে এসেছে।

আর একটা কাজ দুই এক দিনের মধ্যেই করব। আমাকে আবার নূতন একখানি উইল করতে হ'বে। তাতে আমার যা কিছু আছে, সমান দুই ভাগ করে এক ভাগ তিনকড়িকে, আর এক ভাগ তোমার ছেলে ভবশঙ্করকে দিয়ে যাব। আমার যা পেন্সন আছে, তাতেই আমার দিন কেটে যাবে। এই পত্র যখন তোমাদের হাতে পৌঁছিবে, তার আগেই উইল রেজেষ্টরী হ'য়ে যাবে, আমিও অষ্ট্রেলিয়া যাত্রা করব; সুতরাং তোমরা আমার এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কোন আপত্তি করবার সময়ই পাবে না।

আর একটা কথা বলি। যদি পার, তা হ'লে সুশীলার স্মৃতি-রক্ষার জন্য কিছু কোরো। কি করবে, তা আমি জানিনে, বল্তেও পারব না।

যেখানেই থাকি, তোমাদের কথা ভুলব না, তোমরা যে আমার সুশীলার বড় স্নেহের পাত্র ছিলে।

বিদায় হরেন্দ্রনাথ, বিদায় রাণীমা!

তোমাদের হতভাগ্য
গ্রেহাম

শেষ

